গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা

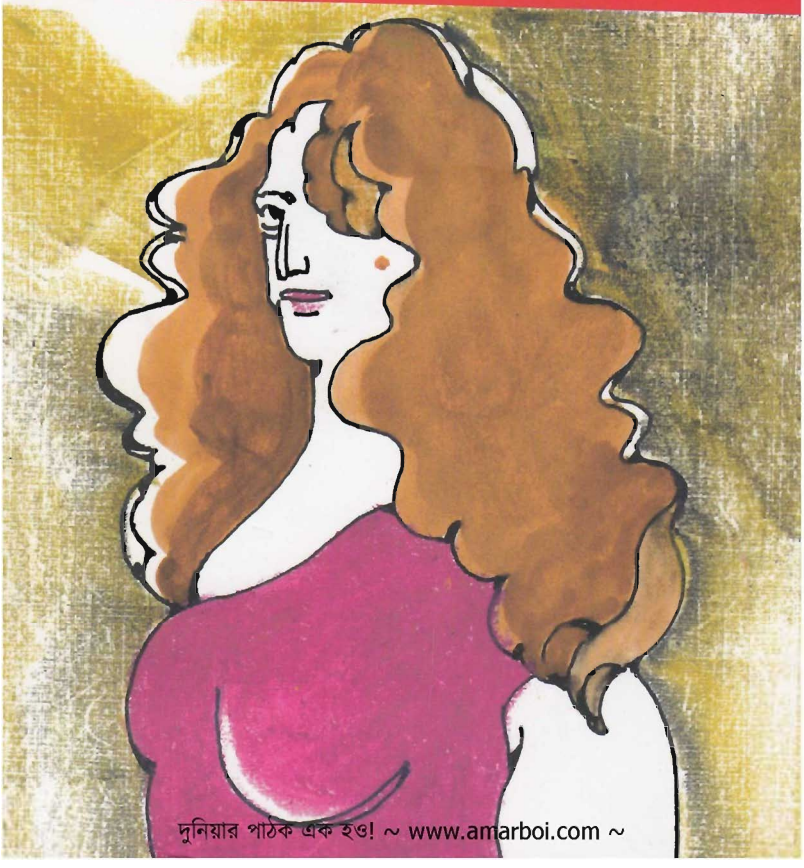

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বয়স নব্বই পূর্ণ হওয়ার দিন ইচ্ছে হলো, উঠতি বয়স্কা কোনো কুমারীকে সারা রাত ধরে পাগলের মতো ভালোবাসি। রোসা কাবার্কাসের কথা ভাবলাম। রোসার মালিকানায় ছিল এক পতিতালয়। মনে পড়ে, তার ওখানে নতুন কোনো মেয়ে এলেই খাস কাস্টমারদের খবর দিতে ভুলত না সে। বহুবার ডাকার পরও রোসার ওই লোভনীয় ডেরায় যাইনি, তার কোনও কুপ্রস্তাবেও সাড়া দিইনি কখনও। যদিও সে আমার এ নৈতিকতাকে থোড়াই পাত্তা দিত। 'সময়ে কোথায় ধুইয়া-মুইছা যাইব এই সব নৈতিকতা', মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে এমনটা বলত রোসা।

ISBN 978 984 8765 57-9
9 789848 765579

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

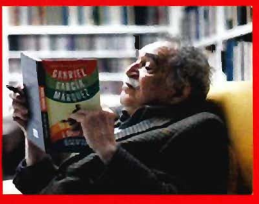

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের একজন প্রবাদপুরুষ। ১৯২৭ সালে কলম্বিয়ার ক্যারিবীয় উপকূলীয় গ্রাম আরাকাতাকায় জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইনশাস্ত্রে অধ্যয়নের পর সাংবাদিকতা দিয়ে পেশাজীবনের শুরু স্বদেশ কলম্বিয়ায়। গল্প দিয়ে লেখালেখির শুরু হলেও ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত মহাকাব্যিক উপন্যাস *সিয়েন আনিয়োস দে সোলেদাদ* (নির্জনতার এক শ বছর) তাঁকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৮২ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনী, নাটক, বক্তৃতামালা—সবই বিশ্বব্যাপী পাঠকদের আকৃষ্ট করেছে। ১৭ এপ্রিল ২০১৪ মেহিকো সিটির নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের স্প্যানিশ ভাষা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের অধ্যয়ন লন্ডন ও দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাদায় আর তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অধ্যয়ন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক হিসেবে স্প্যানিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পড়েছেন মাদ্রিদের কোমপ্লুতেনসে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫০-এর দশকের কলম্বিয়ার বার্‌রানকিয়ার প্রেক্ষাপটে লেখা ১০৯ পৃষ্ঠার আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা উপন্যাসের আখ্যানকারী ও মূল চরিত্র তাঁর সঙ্গে রাত কাটানো পাঁচশ জনেরও অধিক রমণীর প্রত্যেককে পয়সা দিয়ে ভাড়া করেছেন যদিও, কিন্তু উপন্যাসটি বেশ্যাদের নিয়ে নয়। এর মূলে আছে প্রেম। কিপ্‌টে লোকটা জীবনের নব্বইতম জন্মদিনে হঠাৎ নিজেকে একটি অন্য রকমের রাত উপহার দিতে যাওয়ার বায়নায় তাঁর বহুদিনের পরিচিত কিন্তু অনেক বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই, এ রকম এক বেশ্যালয়ের সর্দারনির বহু আগে দেওয়া অসংলগ্ন প্রস্তাবের কথা ভেবে তাকে ফোন করে বলে, 'আমার একটা কুমারী মেয়ে দরকার এবং সেটা আজ রাতেই।' ব্যস! সবকিছু পাল্টে গেল। যে বয়সে বেশির ভাগ মানুষ আর দুনিয়ায় বেঁচে থাকে না, সেই বয়সে তাঁর জীবন এক নতুন মোড় নেয়। প্রেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা

এস্পানিয়োন থেকে অনুবাদ
রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমা প্রকাশন

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১১ অনুবাদক
দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২১, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রথমা সংস্করণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১
প্রথম প্রকাশ : ২০০৬
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২২০ টাকা

Amar Dukkhobharakranto Beshyader Smritikotha
Bengali Translation of Gabriel García Márquez's novel
Memoria de mis putas tristes
Translated from Spanish by Rafique-um-Munir Chowdhury
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 220 only

ISBN 978 984 8765 57 9
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বেলাল চৌধুরী
যাঁর কাছে প্রথম গার্সিয়া মার্কেসের গল্প শুনেছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

এ-অনুবাদবইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ) বের হবে, তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। গার্সিয়া মার্কেসকে নিয়ে পাঠকদের উন্মাদনা আর ভালোবাসাই এর কারণ। আগের সংস্করণের সামান্য কিছু ভাষাগত ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হল। পাঠকসমাদৃত এ-অনুবাদটি সাক্ষ্য দেয় গাবোর লেখায় কী জাদু আছে। দুনিয়া থেকে চিরতরে চলে গিয়েও তিনি আমাদের অমরত্বের গান শুনিয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশককে ধন্যবাদ।

রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী
২৯ ডিসেম্বর ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের কথা

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষে হিস্পানি মোন্দাদোরি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সর্বশেষ উপন্যাস *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তেস*-এর একটি কপি আমার হাতে এসে পৌঁছায় ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে। স্পেনের বার্সেলোনা থেকে এটি কিনে এনে দিয়েছিল আমার বন্ধু ও সহকর্মী ফ্রান্সেস্ক লুসিও গোন্সালেস। স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক হিসেবে স্প্যানিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে স্বল্পমেয়াদি উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য সে বছরই মাদ্রিদে যেতে হয়। সেখানকার কোমপ্লুতেন্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আবাসিক হলে কাটানো গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো আজ আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে এই অনুবাদকর্মটির কারণে। বেশ কয়েকবার পাঠের পর দুরুদুরু বক্ষে অনুবাদ করতে শুরু করলাম এক সন্ধ্যায়। অনুবাদ হলো পাঠের সেরা পাঠ। কীভাবে পড়ছি, আর কতটুকু বুঝে পড়ছি, তার ওপর নির্ভর করে অন্য ভাষার একটা বই আত্মস্থ করার ব্যাপারটা। লেখকের জীবন, বেড়ে ওঠা, চিন্তা-ধারণা, তাঁর দেশ ও সময়কাল—এসব তো বুঝতেই হয়। আর গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস বলে তো কথা! স্প্যানিশ ভাষার ওপর দখল তো অত্যাবশ্যকীয়, তার ওপর জানা দরকার, তাঁর স্বদেশ কলম্বিয়ার ক্যারিবীয় উপকূলীয় সংস্কৃতির পটভূমি। ওই অঞ্চলের মানুষের বাচনিক অনুষঙ্গগুলোও বোঝা দরকার। সব মিলিয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চার। এই অ্যাডভেঞ্চারে আমাকে সহায়তা করেছেন আমার বন্ধু ফ্রান্সেস্ক, রাজু আলাউদ্দিন এবং যাঁর কথা না বললেই নয়—লাতিন আমেরিকান কথাসাহিত্যের গুরু আর্হেন্তিনার কিংবদন্তি হোর্হে লুইস বোর্হেসের প্রায় সমগ্র রচনাকর্ম ইংরেজিতে হাজির করার পেছনে যাঁর অবদান অসামান্য, সেই বিখ্যাত অনুবাদক নরম্যান টমাস ডি জোভান্নি। তাঁর স্নেহধন্য হওয়াটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাতিদীর্ঘ ১০৯ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির অনুবাদ একটু একটু করে এগোয়, আর নিজেকে নিজেই পড়ে শোনাই। শ্রবণযন্ত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে অনুবাদে। পড়ি আর ছিঁড়ি, আবার লিখি, আবার পড়ি ও ছিঁড়ি। এভাবে কয়েক মাস কেটে যায় পরিমার্জিত একটা রূপে পৌঁছাতে। তত দিনে দেশে ফিরে আসি এবং ওই বছরের *সুবর্ণরেখা* ঈদসংখ্যায় বইটির অংশবিশেষের অনুবাদ বের হয়। এ সুযোগে বন্ধু কবি শামীম রেজা ও মাসুদ হাসানের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা স্মরণে আনতে চাই। ২০০৬ সালের একুশে বইমেলায় বইটি পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি বিভিন্ন সময়ে, যা আমাকে উৎসাহিত করেছে। প্রায় দুই বছর হয় এর আগের সংস্করণ ফুরিয়ে গেছে। তাই নতুন করে প্রকাশের এই উদ্যোগ। *প্রথমা*র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

গার্সিয়া মার্কেসের স্প্যানিশের ব্যাকরণগত কাঠামো, বাক্যগঠন, ছন্দ, শৈলী এতটাই অভিনব ও চমৎকার যে অনুবাদ করতে বসে মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না, আর ওই ঘোরটাই পাঠের ভেতরের পাঠে নিয়ে যায়। মূল স্প্যানিশ থেকে গার্সিয়া মার্কেসের রচনা অনুবাদের সমস্যা হলো, তিনি এতটাই যথাযথ শব্দ, বিশেষণ ও জাদুকরি সব বাক্য লেখেন যে তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব, বাংলায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করাটা অসম্ভব এক স্বপ্নের শামিল। পাশাপাশি রয়েছে কবিতার গন্ধমাখা তাঁর গদ্যের ঐন্দ্রজালিক ঝংকার। শব্দের যে মূল অর্থ তার সঙ্গে ছন্দের একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং এ দুয়ে মিলে একটা ঐকতান সৃষ্টি হয়। বিরামচিহ্ন না বসিয়ে হিস্পানি রীতিতে দীর্ঘ-সব বাক্য লেখেন গার্সিয়া মার্কেস, যা বাংলায় প্রায়ই ভাঙতে হয়, অনেক বাক্যে সাজিয়ে পড়ে দেখতে হয় বাংলায় পাঠযোগ্য হয়ে উঠছে কি না সেই রচনা। ভৌগোলিক, স্থানিক ও অন্যান্য বিশেষ্যবাচক, বিশেষ্যর বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে হিস্পানি আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে। উপন্যাসটির নামকরণে 'পুতাস ত্রিস্তেস' শব্দযুগল অনুবাদকের জন্য একটি কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা সৃষ্টি করে। এখানে অনুবাদের সাংস্কৃতিক দিকটি চলে আসে। 'পুতাস' অর্থ বেশ্যা। গার্সিয়া মার্কেস গণসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তিনি ভাষার চলতি বা কথ্য রূপটিকে প্রাধান্য দেন। 'পুতা' একবচনে, বহুবচনে 'পুতাস'। 'পুতা' শব্দ দিয়ে স্প্যানিশে গালাগালি চলে, গার্সিয়া মার্কেস 'পুতা'র প্রতিশব্দ ব্যবহার করেননি। আর 'ত্রিস্তে' বিশেষণটির অর্থ বাংলায় 'দুঃখী'। এ ক্ষেত্রে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি মাথায় রাখতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্য ও পদ্য দুটোতেই যাঁর সমান বিচরণ, সেই গুণীজন বেলাল চৌধুরীর স্নেহধন্যেই মূলত আমার বিশ্বসাহিত্য, বিশেষ করে, লাতিন আমেরিকান সাহিত্য পড়ার শুরু। আমার লেখালেখির পেছনে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের অনুপ্রেরণার কথা বলাটা কতটা যে সুখের, সে কথা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার সহকর্মী ফ্রান্সিসকো রামোস পান্তোরের সঙ্গে দিনের পর দিন গাবো ও সমকালীন কলম্বীয় সাহিত্য নিয়ে কত যে আড্ডা হয়েছে, তার হিসাব মেলানো যাবে না। এ সুযোগে ফ্রান্সিসকোকে ধন্যবাদ জানাই। *সিন্দাবাদ* সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক: আলীম আজিজ, দিলওয়ার হাসান, ধ্রুব এষ, আনিসুজ্জামান খানকে ধন্যবাদ আমাদের অভিযানকে সচল রাখার জন্য। নীলক্ষেতের পুরোনো বইয়ের বাজার আর এর দুই দোন কিহোতে নাজিবুর রহমান বাবু এবং আশরাফুল আলম বাবুলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

স্প্যানিশ ও লেখালেখি-সংক্রান্ত আমার যাবতীয় পাগলামি-সমেত আমাকে সয়ে নেওয়ার জন্য সবশেষে আমার মা-বাবা, স্ত্রী নাজমুন, কন্যা জাহ্‌রা, দুই সহোদরা রিফাত ও জুমানাকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।

পাঠকেরা এই অনুবাদটি পড়ে আনন্দ পাবেন—এতটুকুই আশা।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগতের সবচেয়ে আশ্চর্য-সুন্দর গল্পকথক

রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী

গাবো

জগতে এমন জ্যোতির্ময় মানুষ আছেন, যাঁরা এমন মনীষা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যে তাঁর ছোঁয়ায় অমরত্বের ঠিকানা মেলে। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, গাবো নামেই যিনি সমধিক পরিচিত, বিশেষ করে স্প্যানিশভাষী বিশ্বে, তাঁদেরই একজন। এ কথা সবারই জানা যে গাবো আজকের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের একজন। বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে গাবো এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম।

ঐন্দ্রজালিক ও পৌরাণিক, গাবোর লেখনীতে এমন এক জাদু আছে, যার মোহিনী শক্তিতে আমরা আচ্ছন্ন হই; মনে হয়, যেন ঝিলমিল আয়নামোড়া এক হলঘরে আমরা হারিয়ে গেছি। তাঁর রচনা পড়তে পড়তে ভাবালুতায় পেয়ে বসে আমাদের। একই সঙ্গে সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক গাবোর আবেগ এমন একটা সমতলে স্থাপিত, যেখানে তাঁর প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও লেখনীর স্বর্গীয় সুষমা সম্মোহনী বাস্তবতার এক অসীম জগৎ বুনে যায়। 'গাবো'—এ দুই অক্ষরের বিশ্বজনীনতা এতই যে শুধু তাঁর নামটি উচ্চারণ করলেই হলো, অমনি ওই ভাষায় স্মৃতির, প্রেম-অপ্রেমের, দেখা-অদেখার ঘূর্ণি বইতে শুরু করে।

সাহিত্যের ভুবনে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস আজ এক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড। গত চার দশক জুড়ে পৃথিবীব্যাপী তাঁর খ্যাতি গগনচুম্বী। আর্হেন্তিনার কিংবদন্তি লেখক হোর্হে লুইস বোর্হেস (১৮৯৯-১৯৮৬) এবং সদ্য নোবেলজয়ী পেরুর মারিও বার্গাস য়োসা ছাড়া এতটা নামডাক বোধ করি আর কোনও লাতিন আমেরিকান কথাসাহিত্যিকের নেই ওই পর্যায়ে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে গার্সিয়া মার্কেস একটি ব্যতিক্রমী নাম। সমালোচক ও পাঠক উভয়েরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান নেওয়া কলম্বীয় এই লেখকের পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সব পাঠকের সংখ্যা একত্র করলে সেটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল ১০টি দেশের একটির সমান।

ঈর্ষণীয় রকম জনপ্রিয় গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একেকটি নতুন বই লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তেস*-এর (আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা) প্রথম সংস্করণ বাজারে ছাড়া হয়েছিল ১০ লাখ কপি, যার তিন লাখ কপি শুধু স্পেনের বাজারের জন্য, আর বাকিটা স্প্যানিশ আমেরিকার জন্য। বলা বাহুল্য, প্রথম সপ্তাহেই শুধু স্প্যানিশ আমেরিকাতেই বইটির বিক্রি ছাড়িয়ে গিয়েছিল চার লাখ। সিরিয়াস সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বই বেস্ট সেলার তালিকায় অনায়াসে দাবড়ে বেড়ায় মাসের পর মাস। খুব কম ভাষাই আছে পৃথিবীতে, যে ভাষায় তাঁর রচনা এখনো অনুবাদ হয়নি। তাঁর এই বিশ্বজোড়া খ্যাতির পেছনে মূলত রয়েছে তাঁর রচনার সাবলীলতা ও সৌন্দর্য এবং তার ঐন্দ্রজালিক আবেশ।

ক্রান্তীয় অর্কিডের স্মৃতিকথা

১৯৮২ সালের নোবেল বিজয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস বারংবার বলেছেন যে তাঁর নয় বছর বয়সে প্রাণপ্রিয় মাতামহ কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেস মেহিয়াকে সারা জীবনের জন্য হারানোর পর তাঁর জীবনে আর বলার মতো ঘটনা তেমন কিছুই নেই। তাই তাঁর উপন্যাসগুলো যেন সেই ছোটবেলাকার অনুভূতি ও স্মৃতির কাতর অন্বেষণ।

একজন লেখক হিসেবে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি গাবো নিয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স ২২। তাঁর মা লুইসা সান্তিয়াগার সফরের সঙ্গী হয়ে স্টিমার আর নড়বড়ে ট্রেনে চেপে গিয়েছিলেন কলম্বিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার কেন্দ্রভাগে অবস্থিত জলাভূমি ও কদলী বাগিচায় ঘিরে থাকা গ্রাম আরাকাতাকায়। বাহ্যত উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাতামহের বাড়িটা বিক্রি করা, যে বাড়িতে লেখকের জন্ম এবং আট বছর বয়সের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে।

২০০২ সালে প্রকাশিত *বিবির পারা কোনতারলা* (জীবনের গল্প বলার জন্যই বেঁচে থাকা) নামে আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের শুরুতে এক জায়গায় এই সফরের উল্লেখ করে গাবো বলছেন, 'ট্রেনটা জনমনুষ্যবিহীন একটা গ্রামের স্টেশনে একটু থামে এবং খানিকক্ষণ পর পথের পাশের একটা কদলী বাগিচার সামনে দিয়ে পার হয় আর ওখানটায় দরজায় লেখা : *মাকোন্দো*।'

গাবোর পরিবার সেবার বাড়িটা বিক্রি করেনি, কেউ তখন ভাড়া থাকত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব বাজে দশা ছিল বাড়িটার। কিন্তু বাড়ি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে গিয়ে আরাকাতাকায় গাবোর সেই সফর, শৈশবের স্মৃতি এতটাই আক্রান্ত করল তাঁকে যে সেই থেকে একটা কাল্পনিক জগতের ছবি ভর করল তাঁর ওপর, যে জগতের প্রেমে আমরা পড়লাম একে একে সবাই। আরাকাতাকা থেকে জন্ম নিল মাকোন্দো, আর তার মাতামহকে ঘিরে তৈরি হলো ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত মহাকাব্যিক *সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ* (নিঃসঙ্গতার এক শ বছর) উপন্যাসের কিংবদন্তিতুল্য চরিত্র কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া। এক ক্রান্তীয় জগৎ সৃষ্টি করলেন গাবো—যেখানে উদ্ভট ও অসম্ভব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, এর রং চড়ানো অতিকথন, এর আনন্দদায়ক তালগোল পাকানো হাস্যরস, ট্র্যাজেডি এবং সাধারণ মানুষের অতিসাধারণ জীবনের জয়গান নিয়ে উপন্যাসটি লাতিন আমেরিকার সদাবাস্তবতার মূর্ত রূপ দেয়। বুয়েন্দিয়া পরিবারের ছয় প্রজন্মকে নিয়ে রচিত মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসটি মহাদেশটির উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীনতা পর্বের ইতিহাসের একটি রূপক। লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের পুরাণ নিয়ে রচিত মাকোন্দো উপাখ্যানটি যেন স্বর্গোদ্যান থেকে রহস্যোদ্‌ঘাটন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস। লাতিন আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে মাকোন্দো এক অনুবিশ্ব আর বুয়েন্দিয়া পরিবারের ছয় প্রজন্মের কাহিনি একই সঙ্গে বাস্তবতার ধরন-ধারণ, বিশ্বজনীন মানবজাতির নিয়তি ও সমস্যাসংকুল লাতিন আমেরিকার কথা বলে। মাকোন্দো নামের কাল্পনিক এই ভূখণ্ড সৃষ্টির ধারণাটি গার্সিয়া মার্কেস পেয়েছিলেন সাহিত্যগুরু ফকনারের কাছ থেকে।

লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা ইউরোপ-আমেরিকার বাস্তবতার চেয়ে আলাদা। গাবোর রচনায় তাঁর মহাদেশের অতীত, বিশেষত তার স্বদেশ কলম্বিয়ার ইতিহাস নিয়ে তাঁর সুগভীর উদ্বিগ্নতা চোখে পড়ে। তাঁর গল্প-উপন্যাস আমাদের সামনে মেলে ধরে লাতিন আমেরিকার বাস্তবতার এক গভীর বোধ। এ এমনই এক সংস্কৃতি, যেখানে পুরাণ বিরামহীনভাবে কথা বলে যায় স্বপ্ন ও নৃত্য, সংগীত ও খেলার স্বরে, কিন্তু যেখানে কোনও কিছুই বাস্তবতায় রূপ পায় না, যতক্ষণ না সেগুলো লিখিতরূপে উপস্থিত হচ্ছে—কলম্বাসের ডায়েরি, এর্নান কোর্তেসের চিঠি, বের্নাল দিয়াসের স্মৃতিকথা, ক্যারিবীয় অঞ্চলের আইনকানুন বা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির সংবিধানের মধ্য দিয়ে। গাবো তাঁর উপন্যাসে ঠিক সে কাজটিই করেন—সেই স্বাতন্ত্র্য সেই সান্নিধ্যতা। তাঁর গল্প-উপন্যাসের জগতের যুগপৎ ঘটমান প্রকৃতি অপ্রতিরোধ্যভাবে লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক বাস্তবতার (স্বপ্ন, অভ্যাস, নিয়মকানুন, তথ্য, পুরাণ) সঙ্গে যুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেয়ালিসমো মাহিকো বা ম্যাজিক রিয়ালিজম মূলত ঢালাওভাবে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয়-মার্কিন সাহিত্য সমালোচক এবং পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত আখ্যা যেটা অন্যভাবে, লাতিন আমেকিার বাস্তবতা প্রসঙ্গে, কুবা'র প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ের আখ্যায়িত করেছিলেন *লো রেয়াল মারাবিয়োসো* বা মারভেলাস রিয়াল হিসেবে, সেই ১৯৪৯ সালে তাঁর *রেইনো দে এস্তে মুন্দো* (এই মর্ত্যের রাজত্ব) উপন্যাসের মুখবন্ধে। লাতিন আমেরিকার উপন্যাস প্রসঙ্গে ঢালাওভাবে সদবাস্তব বা অলৌকিক বাস্তবজাতীয় বিশেষণ ব্যবহার করা হলেও সব লেখক বা তাঁদের সব রচনাই কিন্তু তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে দেখেছি মারিও বার্গাস য়োসা, কার্লোস ফুয়েন্তেস ও ইসাবেল আয়েন্দের সঙ্গে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁদের সবারই বক্তব্য, লাতিন আমেরিকার বাস্তবতার ধরন-ধারণটাই যে ও রকম : ফ্যান্টাসি, জাদুটোনা আর ইন্ডীয় অতীতের ইতিহাস ও পুরাণমিশ্রিত এক অন্য রকমের বাস্তবতা। এ প্রসঙ্গে খোদ গাবো নোবেল ভাষণে বলেছেন, 'বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে নেই কোনো সীমারেখা। সমগ্র লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সদবাস্তবতা। ইউরোপীয়রা আমার বই পছন্দ করেন আমার রচনায় তাঁরা ম্যাজিক ও ফ্যান্টাসি দেখতে পান বলেই। কিন্তু আমার রচনা আসলে কিন্তু সেসব কিছু নয়। লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা মানেই আমাদের নিত্যদিনের বাস্তবতা। সরল আর নিষ্পাপ চোখে বাস্তবতার দিকে সোজাসুজি দেখা। ম্যাজিক রিয়ালিজম মানে আমাদের বাস্তবতার ভেতরকার অলৌকিকতা। ইউরোপীয়রা যতটা যুক্তিবাদী সে অর্থে আমাদের মন-মানসিকতা ঠিক ততটা যুক্তিবাদী নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। আমরা যেভাবে আমাদের বাস্তবতাকে প্রকাশ করি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি, যুক্তিবাদীদের পক্ষে সেটাকে ঠিক সেভাবে বোঝা বা উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। লাতিন আমেরিকানদের দেখলে মনে হবে, তারা অর্ধেক স্বপ্ন আর অর্ধেক দুর্নীতির ভেতর জীবন কাটায়। সদবাস্তববাদ আমাদের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।'

১৯৬৮ সালে লেখা *ব্লাকামান এল বুয়েনো, এল বেনদেদোর দে মিলাগ্রোস* (অলৌকিকের ফেরিঅলা সাধু ব্লাকামান) গল্পের শেষের দিকে এক জায়গায় গল্পের আখ্যানকারী বলেন, 'সেনঞরা ও সেনঞরগণ, আপনাদের সঙ্গে যেসব ধাপ্পাবাজি আর মিথ্যাচার আমি করেছি, এরপর আমাকে বিশ্বাস না করাটা আপনাদের ষোলোআনা খাটে, কিন্তু আমি আমার মায়ের হাড়গোড়ের দোহাই দিয়ে বলছি যে আজ আপনাদের যেটা দেখাব, সেখানে কিন্তু অলৌকিক ছলচাতুরী কিছুই নেই, বরং জলজ্যান্ত ডাহা সত্য...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবিক কণ্ঠে অলৌকিকের গল্প ফেঁদে রীতিমতো বিস্ময়কর বর্ণনারীতিতে এক নতুন গদ্যশৈলীর উপন্যাস *সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ* (নিঃসঙ্গতার এক শ বছর) বেরোনোর পরপরই গাবো পেয়েছিলেন খ্যাতি আর সাফল্য। ১৯৬৭ সালে বেরিয়েছিল স্প্যানিশে, আর ১৯৭০ সালে গ্রেগরি রাবাসার তাক লাগানো অনুবাদে বেরোল এর ইংরেজি সংস্করণ। ব্যস! সেই শুরু গাবোর বিশ্বজয়ের। অসাধারণ কয়েকজন লাতিন আমেরিকার লেখকের প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে সফলই শুধু হলেন না, উপরন্তু বলা চলে, তাঁদের গুরুও তিনি।

তাঁর গল্প-উপন্যাসে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতার উপকথা, কিংবদন্তি, পুরাণ, স্মৃতিচারণ, ও কুসংস্কার একই সুতায় গাঁথা। পালাক্রমে, কৌতুকপ্রদ ও ভয়াবহ কাহিনির মিশেলে তাঁর রচনা যেন এক সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কল্পনাকে আশ্রয় করে লেখা। *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর* নব-ঔপনিবেশিক নির্ভরশীল দশা ও অলীক চেতনা থেকে এক ঐতিহাসিক স্পষ্টতায় কাল্পনিকভাবে লাতিন আমেরিকার মানুষের জেগে ওঠার গল্প, এর মাধ্যমে তাদের আর সব মানুষের সমপর্যায়ে পৌঁছানোর পথ সুগম হয়।

বিশাল ডানাঅলা এক কলম্বিয় গ্রাম্য বালক

নিজ ভূখণ্ডের মানুষের হারানো সময়, এর স্বর্ণালি অতীত ও তার গান, তার স্বপ্নের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমেই কেবল লাতিন আমেরিকা স্বপ্ন দেখতে পারে ভবিষ্যতের। এই মহাকাব্যিক বোধে তাড়িত হয়ে কবি পাবলো নেরুদা লিখেছিলেন *কান্তে হেনেরাল* (সাধারণ গীত), যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি বোবা মহাদেশের মুখে ভাষা দেওয়া প্রয়োজন, সেদিন এ ব্যাপারটির গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন নেরুদা।

ঠিক একই কথা প্রতিধ্বনিত হলো ১৭ বছর পর, ১৯৬৭ সালে, যখন গাবো লিখলেন *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*। একটা হারানো সময়ের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পুরোনো বাস্তবতাকে নতুনে রূপান্তর করার রচনাকৌশল যে কেমন করে অত্যাশ্চর্য উপন্যাস হয়ে ওঠে, সেটা হাতে-কলমে দেখালেন গাবো। লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের লোকপুরাণ এই মাকোন্দো উপাখ্যান।

সের্বান্তেসের *দোন কিহোতে* (বিশ্বসাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত) উপন্যাসের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৬০৫ সালের প্রথম দিকটায়। সেটা বেরোনোর ৩৬২ বছর পর সের্বান্তেসের সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস লিখলেন *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*। কি ভাষা, কি শৈলী, কি বাস্তব-অবাস্তবের দোলাচল—সব মিলিয়ে উপন্যাসটি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাতিন আমেরিকার সাহিত্য তথা স্প্যানিশ ভাষা-সাহিত্যকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দিল, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বব্যাপী তোলপাড় পড়ে গেল স্প্যানিশভাষী লাতিন আমেরিকার সাহিত্যকে ঘিরে। হিস্পানি আমেরিকার *দোন কিহোতে* নামে আখ্যায়িত *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর* উপন্যাসটি বিশ্ব জয় করার ঢের বহু আগে পাবলো নেরুদা বলেছিলেন, 'আমাদের সাহিত্যে নতুন যুগের এক সের্বান্তেস এসে গেছেন।'

আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি কথাটার তৎপর্য। রোমান চিরসুন্দরী মা মারিয়া লুইসা সান্তিয়াগা ইগুয়ারান আর উৎসবে-অনুষ্ঠানে বেহালা বাজানো টেলিগ্রাফ অপারেটর বাবা গাব্রিয়েল এলিহিও গার্সিয়ার ১১ সন্তানের মধ্যে সবার বড় গাব্রিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেস ওরফে গাবো কলম্বিয়ার অতলান্তিক উপকূলে কদলী বাগিচায় ঘেরা গ্রাম আরাকাতাকায় বেড়ে উঠেছেন। রক্তের অন্তর্গত ক্যারিবীয় সংস্কৃতি আর অত্যন্ত আদরের মাতামহীদের ব্যক্তিগত প্রভাব তাঁর উপন্যাসের ভেতর গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর যাবতীয় গল্প-উপন্যাসে দেখা যায় সেই ক্যারিবীয় উপকূলবর্তী জনপদের এক হৃদয়ছোঁয়া স্মৃতিচারণা ও রূঢ় বাস্তবতা। যে গ্রামের কথা প্রায় কেউই জানত না, সে আরাকাতাকা গ্রামই চিহ্নিত হলো বিশ্বমানচিত্রে, গাবোর কল্যাণে। উল্লেখ্য, কলম্বিয়ার অন্তর্গত ক্যারিবীয় উপকূল কিন্তু দেশটির আন্দেস পার্বত্য অঞ্চল থেকে একেবারেই ভিন্ন, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে। ক্যারিবীয় উপকূলের মানুষ অনেক বেশি হইহল্লাপ্রিয় এবং আমুদে ও মিশুক। অসাধু ড্রাগ ব্যবসার খপ্পরে পড়ার আগে একসময় কিন্তু জায়গাটা ছিল আরাম-আয়েশে কাটানোর ক্রান্তীয় এক জনপদ। রাজধানী বোগোতা থেকে তখন নৌকা দিয়ে মাগদালেনা নদীপথে আসতে এক সপ্তাহ লাগত। মাতামহীদের সঙ্গে শৈশব অতিবাহিত করার পর এই নদীপথেই এ রকম নৌকায় গাবো সরকারি এক বৃত্তি নিয়ে মাধ্যমিক পড়ার জন্য বোগোতার কাছাকাছি সিপাকিরায় গিয়েছিলেন ১৯৪৩ সালের দিকে। বোগোতার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব কলম্বিয়ায় আইন বিষয়ে এক বছরাধিক কাল পড়ার সময় ১৯৪৮ সালে চাক্ষুষ করলেন দাঙ্গা-বিদ্রোহ-সংঘর্ষ। শুরু হলো কলম্বিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত ও ভয়াবহ অধ্যায়, যেটা *লা বিয়োলেন্সিয়া* নামে পরিচিত। এই অধ্যায়কালে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন গৃহযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত *এল কোরোনেল নো তিয়েনে কিয়েন লে এস্ক্রিবা* (কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না) নামের ছোট উপন্যাসটি এই গৃহযুদ্ধগুলোর পটভূমিতেই সাজানো।

গাবো বহুবার বলেছেন, তাঁর গল্পকাহিনিগুলো একটিমাত্র ইমেজ থেকে জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়, যে ইমেজ তাঁকে তাড়া করে। ১৯৫৫-৫৭ সালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্যারিসে শোচনীয় জীবন যাপন করার সময় তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল তাঁর জীবনের এক স্মৃতিময় পর্বের কথা, যার ঘটনাস্থল উত্তর কলম্বিয়ার উপকূলীয় শহর বার্‌রানকিয়া। এক লোককে দেখা যেত সেখানে খেয়াঘাটে বসে থাকতে। দিনের পর দিন মাছের বাজারের বাইরে নদীর ঘাটে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সে ঠায় বসে থাকত নৌকাগুলোর দিকে চেয়ে। প্রকারান্তরে এ ইমেজটা গাবোকে মনে করে দিয়েছিল তাঁর আপন মাতামহের কথা, *গেররা দে মিল দিয়াস* (সহস্র দিনের যুদ্ধ) নামের যুদ্ধে উদারপন্থী শিবিরে কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ একটা সম্মানী পাওয়ার আশায় যিনি একসময় বছরের পর বছর অপেক্ষায় থেকেছেন। কলম্বিয়ার ইতিহাসে সে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত। এই ইমেজই অনুপ্রাণিত করেছিল গাবোকে, পেনশনের জন্য প্রতীক্ষারত এক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের কাহিনি রূপায়ণে, যার নাম *কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না*।

গাবোর রচনা তাঁর জন্মভূমির মানবিক মূল্যবোধগুলোকে বিশ্বজনীন করে তোলে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর সমৃদ্ধ শৈশবকে কাজে লাগিয়েছেন। শৈশবে মাতামহী শিশু গাবিতোকে নানা রকম কিংবদন্তি, উপকথা আর চমকপ্রদ সব বানানো কাহিনি শোনাতেন। গাবো বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই মাতামহীর কাছ থেকে তিনি গল্প বলার কৌশলটা রপ্ত করেছেন। শিশু গাবিতোর নানা কৌতূহল আর প্রশ্নের উত্তর জোগাতে মাতামহীকে আজগুবি সব গল্পকাহিনি ফাঁদতে হতো। গাবো তখন থাকতেন মাতামহীদের সঙ্গে আরাকাতাকায়। তাঁর মা-বাবা ছিলেন বার্‌রানকিয়ায়। ১৯৩০ সালের ১৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তাঁর সহোদরা আইদা রোসা এবং নবজাতক শিশু রোসাকে দেখার জন্য মাতামহীসহ বার্‌রানকিয়ায় যান গাবো। প্রথানুযায়ী জন্মভিটা আরাকাতাকার মাটি খাওয়ানোর জন্য সে যাত্রায় গাবোর মাতামহী গাবোর অন্য সহোদরা মারগোতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আরাকাতাকায়, এই চিন্তায় যে, দুই সহোদর-সহোদরা একসঙ্গে বেড়ে উঠবে। তাঁর মাতামহ, সহস্র দিনের যুদ্ধে অংশ নেওয়া দীর্ঘকালের অভিজ্ঞ সৈনিক, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেস মেহিয়া গাবোর জীবনে যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিলেন সে কথা পুনরায় উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯২৮ সালে কদলী বাগিচাকে ঘিরে একটি আন্দোলন দানা বাঁধে, যেটার নেতৃত্বে ছিলেন গাবোর মাতামহসহ আরও দু-চারজন। সামরিক জান্তার নির্দেশে ৬ ডিসেম্বর সিয়েনাগা রেলস্টেশনে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা ছিল নয়, কিন্তু আসলে মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল। এ ঘটনার উল্লেখ আছে *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর* উপন্যাসে। পরে সামরিক জান্তা কর্তৃক গাবোর মাতামহীদের বিয়ের আংটি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাটাও শিশু গাবোর মনে এক গভীর রেখাপাত করে। বলতে হয় ক্যারিবীয় উপকূলের প্রকট গ্রীষ্মতাপ আর ক্রান্তীয় বৃষ্টি-তাণ্ডবের কথা। আর আছে কলম্বিয়ার অতলান্তিক উপকূলের বিচিত্র সব সংগীত, যেমন বায়োনাতোস, বোলেরো ইত্যাদির প্রতি গাবোর প্রবল আসক্তি। এসবের প্রভাব এবং উল্লেখ লক্ষ করা যায় ঘুরেফিরে তাঁর কথাসাহিত্যে। অলৌকিক, জাদুটোনা-জাত, অজানা, অনাবিষ্কৃত এক ভূখণ্ডের মানুষের জীবনযাত্রা ও তার নিসর্গ-প্রকৃতির উচ্ছলতাকে পুরামাত্রায় বিশ্বজনীন করে তুলেছেন গাবো তাঁর সমগ্র রচনাকর্মে।

বার্ধক্য ও প্রেম

প্রেমের কি কোনও বয়স আছে? না। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের সর্বশেষ উপন্যাস *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ক্রিস্তেস* (আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা) শুরু হয়েছে এভাবে: 'আমার বয়স নব্বই পূর্ণ হওয়ার দিন ইচ্ছে হলো উঠতি বয়স্কা কোনো কুমারীকে সারা রাত ধরে পাগলের মতো ভালোবাসি।' ২০০২ সালের অক্টোবরে *জীবনের গল্প বলার জন্যই বেঁচে থাকা* নামে আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ড বেরোনোর ঠিক দুই বছর পর ২০০৪ সালের অক্টোবরে বের হওয়া *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা* উপন্যাসটির নাম শুনে আর সূচনা বাক্যটি পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন যে উপন্যাসটি বেশ্যালয়ে কাটানো তাঁর জীবনের আধা-আত্মজৈবনিক কাহিনি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। এটা মূলত এক প্রেমকাহিনি। নতুন ধরনের। ভিন্ন স্বাদের। একটি প্রগাঢ় স্পর্শকাতর ভালোবাসার কাহিনি। জীবনে বিয়ে-থা না করা নব্বই বছর বয়সের এক যুবার প্রেমকাহিনি।

১৯৫০-এর দশকের কলম্বিয়ার বার্‌রানকিয়ার প্রেক্ষাপটে লেখা ১০৯ পৃষ্ঠার *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা* উপন্যাসের আখ্যানকারী ও মূল চরিত্র তাঁর সঙ্গে রাত কাটানো পাঁচশ জনেরও অধিক রমণীর প্রত্যেককে পয়সা দিয়ে ভাড়া করেছেন যদিও, কিন্তু উপন্যাসটি বেশ্যাদের নিয়ে নয়। এর মূলে আছে প্রেম। কিপ্‌টে লোকটা জীবনের নব্বইতম জন্মদিনে হঠাৎ নিজেকে একটি অন্য রকমের রাত উপহার দিতে যাওয়ার বায়নায় তাঁর বহুদিনের পরিচিত কিন্তু অনেক বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই, এ রকম এক বেশ্যালয়ের সর্দারনির বহু আগে দেওয়া অসংলগ্ন প্রস্তাবের কথা ভেবে তাকে ফোন করে বলে, 'আমার একটা কুমারী মেয়ে দরকার এবং সেটা আজ রাতেই।' ব্যস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবকিছু পাল্টে গেল। যে বয়সে বেশির ভাগ মানুষ আর দুনিয়ায় বেঁচে থাকে না, সেই বয়সে তাঁর জীবন এক নতুন মোড় নেয়। প্রেম।

লাবণ্য ঘুমিয়ে আছে, ওকে একটু দেখি...

অভাবনীয়ভাবে *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা* উপন্যাসের প্রকৃত নাম-ধামহীন মূল চরিত্র, বয়স নব্বই পূর্ণ হওয়া লোকটি বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনি রোসা কাবার্কাসের জোগাড় করে দেওয়া চোদ্দ বছর বয়স্ক কুমারী বালিকাটির প্রেমে পড়ে।

জীবনে এত ভালোবাসা তার আর কখনো কারও জন্য আসেনি। মেয়েটির সঙ্গে ওইভাবে রাত কাটায় না সে, বরং মনে মনে কথা বলে অনেক। গরিব ঘরের মেয়ে হিসেবে বোতাম লাগানোর ফ্যাক্টরিতে সারা দিন কাজের পর, তার ওপর টোটকা ওষুধের প্রভাবে প্রতি রাতে মেয়েটি কেবল ঘুমায়। আর আমাদের কাহিনির মূল চরিত্র নব্বই বছরের যুবা অগত্যা ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে কেবলই তাকিয়ে থাকে আর তাকিয়ে তাকিয়ে একথা-সেকথা ভাবে। পেছন ফিরে নিজের নিঃসঙ্গ নয়-নয়টি দশকের স্মৃতিচারণা করে। এভাবে রাত পোহায়। লাবণ্য ঘুমিয়ে থাকে। ভোর হয়, আরেকটি রাত আসে। লাবণ্য ঘুমিয়েই থাকে। আবার ভোর হয়। সে শুধু একদৃষ্টে দেখে, তার সামনে লাবণ্য ঘুমিয়ে আছে। কী অদ্ভুত! থাক। ঘুমাক সে।

এক অদ্ভুত প্রেমকাহিনি। ঘুমন্ত, না জাগ্রত—কোন অবস্থায় মেয়েটিকে বেশি ভালো লাগবে? এভাবে গাবো এমন একটি টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি করেন পাঠকমনে, যা আমাদের বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠতে দেয় না। উপন্যাসটি ছোট কিন্তু আবেগের তীব্রতায় ভরা। হাস্যরস আর ব্যঙ্গোক্তিতে ভরা উপন্যাসটির মাধ্যমে নোবেলজয়ী জাপানি ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার (১৮৯৯-১৯৭২) প্রতি গাবো শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভাবে যে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত কাওয়াবাতার বড়গল্প *দ্য হাউস অব দ্য স্লিপিং বিউটিস*-এর কাহিনি গাবোর এই নতুন উপন্যাসটিকে উজ্জীবিত করেছে এবং বইয়ের এপিগ্রাফে কাওয়াবাতার ওই গল্প থেকে গাবো একটি উদ্ধৃতিও তুলে ধরেছেন।

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথার মূল চরিত্র বা আখ্যানকারীর বর্ণনায় সে নিজে দেখতে কুৎসিত, লাজুক স্বভাবের ও সেকেলে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সে যেখানটায় থাকে, সেই নাম-ধামহীন শহরের স্থানীয় একটি পত্রিকায় তারবার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করছে। কিছুদিন লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক হিসেবেও স্কুলে কাজ করেছে, যদিও তার নিজের মতে সে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজে শিক্ষক। পঞ্চাশ বছর ধরে ওই একই পত্রিকায় একটি রবিবাসরীয় কলাম লিখে আসছে। বেশ্যালয়ে যাওয়া শুরু হয়েছিল সেই বারো বছর বয়সে, হাফপ্যান্ট ছেড়ে ফুলপ্যান্ট ধরা হয়নি তখনো। পয়সা ছাড়া সে কোনো দিন কারও সঙ্গে রাত কাটায়নি এবং ব্যাপারটায় এতটাই ডুবেছিল যে বিয়ে করার সুযোগ জোটেনি। বিশ বছর বয়স থেকে একটা নোটবইয়ে লিখে আসছে সেই সব রমণীর নাম-ধাম—যাদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে—কখন, কোথায়, কীভাবে কী হলো সব। এ রকম গল্পেসল্পে ভরা নোটবইটার নাম রাখে *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তেস* (আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা)।

গল্পের মতো জীবন, জীবনের মতো গল্প

আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা উপন্যাসটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। সংগীতপিপাসু আখ্যানকারী মূল চরিত্রটি আমাদের কাহিনিটা শোনায় প্রথম পুরুষে। জীবন-জগৎ নিয়ে প্রচুর ভাবে সে আর লেখে। তার সংগ্রহে অসংখ্য ধ্রুপদি বই। ঠিক নাম-ধাম নেই, কিন্তু আশপাশের দু-একটি নাম যেমন *কার্তাহেনা দে ইন্ডিয়াস* থেকে বোঝা যায় যে যেখানটায় তার সারা জীবন কেটেছে, সেটা গাবোর স্বীয় কলম্বিয়ার উপকূলীয় কোনো শহর। উপন্যাসের শুরুর দিকেই আমরা নির্লান্দিয়া চুক্তি, সহস্র দিনের যুদ্ধ এবং গত শতাব্দীর অসংখ্য গৃহযুদ্ধের উল্লেখ পাই, যেটা আমাদের গাবোর মাতামহের কথা মনে করিয়ে দেয়, স্মরণে আসে *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*-সহ গাবোর অন্যান্য উপন্যাসের প্রসঙ্গ। এই যে এ গল্পে সে গল্পে মাখামাখি, এ উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্র গিয়ে হাজির হচ্ছে আরেক উপন্যাসের এক জায়গায়, এটা গাবোর লেখায় সচরাচরই চোখে পড়ে। অন্তঃপাঠের এই যে বুনন, এটা গাবো এমন মুনশিয়ানায় করেন যে ইতিহাস আর ফিকশন কেমন যেন মিলে যায়, বাস্তবতার ভেতর কেমন করে যেন অবাস্তব ঢুকে পড়ে। গাবো মূলত গল্পকথক। তাই দেখা যায় যে একটা ভালো গল্পের জন্য তিনি প্রকৃত ইতিহাসটাকে কখনোই গল্পের ওপর জেঁকে বসতে দেন না। *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*-এ আমরা যখন আউরেলিয়ানো বাবিলোনিয়ার সঙ্গে জিপসি মেলকিয়াদেসের লেখা পার্চমেন্টে বুয়েন্দিয়া পরিবারের কালপঞ্জি পড়ছি, তখন হঠাৎ চমকে গিয়ে আবিষ্কার করি, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস নামের এক যুবক এসে হাজির যিনি কিছুদিন আগে তাঁর বান্ধবী মের্সেদেসের সঙ্গে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তাকে শেষ দেখা যায় তাঁর বন্ধু আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার কল্পনায়, যেখানে একটা ঘরের মধ্যে সেদ্ধ ফুলকপির গন্ধের মধ্যে বসে বসে মার্কেস খিদের কষ্ট ভুলে থাকার জন্য সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত লিখছেন। মার্কেসের বান্ধবী মের্সেদেস বাস্তবেও গাবোর বান্ধবী ছিলেন সে সময়টায় এবং আজ তাঁর দুই সন্তানের জননী।

গাবোর নিজের বয়স আশি পেরিয়ে গেছে। *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা* উপন্যাসে এ ধারণাটা ভেঙে দিতে চাইছেন যে বার্ধক্য মানেই জরা নয়, বার্ধক্যে পৌঁছেও পুনর্জন্ম ঘটতে পারে। উপন্যাসটির আখ্যানকারী বুঝতে পারে, সে নিজের সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিল তা সত্য নয়। বইয়ে উল্লিখিত জুলিয়াস সিজারের বক্তব্য : অন্যরা তোমার সম্পর্কে যা ভাবে, সেটা না হয়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচার কোনো উপায় নেই—এ কথা খণ্ডাতে সে বদ্ধপরিকর এবং নানা রকম দুর্দৈব বিপত্তির পরও সে শেষ পর্যন্ত তার লাবণ্যর মন পায়, যদিও সে নিঃশব্দে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় প্রহরের পর প্রহর।

গল্প-উপন্যাসের শুরুটা অনেক সময়ই আমাদের মনে গেঁথে যায় চিরদিনের জন্য। সের্বান্তেসের *দোন কিহোতের* সূচনা বাক্যটা এ রকম : 'লা মাঞ্চার কোনো এক জায়গায় হবে, যার নাম আমি আর আজ মনে করতে চাই না।' কাফকার *রূপান্তর*-এর শুরুটা হচ্ছে : 'ঘুম ভেঙে সকালে বিছানায় জেগে উঠে গ্রেগর সামসা দেখে, সে একটা আরশোলায় রূপান্তরিত হয়েছে।' সে রকম গাবোর একেকটা উপন্যাসের শুরুটাই অবিস্মরণীয় : 'বহু বছর পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে কর্নেল আউরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মনে পড়ছিল সেই দূর বিকেলের কথা, যেদিন তার বাবা তাকে সঙ্গে করে বরফ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন...।' এভাবে শুরু হয় *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত *ক্রোনিকা দে উনা মুয়ের্তে আনুনসিয়াদা* (একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি) শুরু হয় এভাবে : 'যেদিন ওরা তাকে মেরে ফেলবে সেদিন সান্তিয়াগো নাসার ঘুম থেকে উঠল ভোর সাড়ে পাঁচটায়...' মা-বাবার প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচিত ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত গাবোর অবিস্মরণীয় উপন্যাস *এল আমোর এন লোস তিয়েমপোস দে কোলেরা* (কলেরা মৌসুমে প্রেম) শুরু হয় এভাবে : 'এ ছিল অবধারিত। তেতো বাদামের ঘ্রাণ হলেই হলো, অমনি তার মনে পড়ে যেত ব্যর্থ প্রেমের নিয়তির কথা।' পাঠকেরা, খেয়াল করলেই দেখবেন যে প্রতিবারই আছে মৃত্যুর উপস্থিতি, তাঁর বইয়ের শুরুতে। আর প্রতিটি বইয়ের নামে আছে সময় বা কালের উল্লেখ।

গল্প বলার জন্যই বেঁচে থাকা

প্রায় পঁচিশ বছর হয় গাবো ফুসফুসে টিউমারজনিত ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন এবং সেরেও উঠেছেন। সেই ১৯৮১ সাল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন মেহিকো সিটিতে, যেখানে নিজেকে প্রায় দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর গৃহবন্দী রেখে লিখেছিলেন *নিঃসঙ্গতার এক শ বছর*, যা আর্হেন্তিনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। মাঝেমধ্যে বেগোতায় যান। জন্মস্থান আরাকাতাকায় সরকারি উদ্যোগে মানচিত্রে জায়গা পেতে যাচ্ছে জনপদ মাকোন্দো, যা এত দিন ছিল শুধু কাল্পনিক। ক্যানসার ধরা পড়ার পরও তাঁর কলম থামেনি। মৃত্যুকে একপাশে সরে যেতে বলে লিখলেন *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তেস* ২০০৪-এ। ১০ বছরে তাঁর প্রথম উপন্যাস। এর আগে শেষ উপন্যাসটি লিখেছিলেন ১৯৯৪ সালে, *দেল আমোর ই ওত্রোস দেমোনিওস* (প্রেম ও অন্যান্য ভূতবিষয়ক)। মাঝে ১৯৯৬ সালে বেরিয়েছিল ড্রাগ চোরাকারবারিদের নেতা পাবলো এস্কোবারকে ঘিরে ঘটা অপহরণের সত্য ঘটনা অবলম্বনে *রিপোর্টাজ নোতিসিয়া দে উন সেকুয়েস্ত্রো* (এক অপহরণের খবর) এবং ২০০২ সালে বেরিয়েছিল ৫৯৬ পৃষ্ঠার আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ড *বিবির পারা কোনতারলা* (জীবনের গল্প বলার জন্যই বেঁচে থাকা)।

এর বাকি দুই খণ্ড আদৌ কি লিখবেন? তিনি নিজে বলেছেন, আর লেখালেখি করবেন না। কিন্তু সেটা কি মেনে নেওয়া যায়? আশি বছর বয়স পেরুনো গাবো ইদানীং অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছেন, মনে করতে পারেন না। নস্টালজিয়াই তাঁর লেখনীর মূল রসদ। ধীরে ধীরে স্মৃতি খুইয়ে ফেলছেন বিধায় তিনি বিমর্ষ, লেখালেখি থামিয়ে রেখেছেন। হয়তো এই কারণেই গত ছয় বছরে তাঁর আর কোনো নতুন উপন্যাস বের হয়নি। এখন পর্যন্ত *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা*-ই তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস।

জীবনের সাতাত্তরটি বছর পার করে দেওয়ার পরও *আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা* উপন্যাসে অত্যাশ্চর্য বর্ণনাক্ষমতা, কবিতার গন্ধমাখা সাবলীল, সংবেদনশীল ও সুন্দর গদ্য এবং হাস্যোদ্দীপক ইমেজ সৃষ্টির মাধ্যমে গাবো প্রাণবন্ত কামজ একটা আবহ তৈরি করেছেন, যেখানে বাস্তবের একটা ইন্দ্রজাল বিছানো। আবারও ভালোবাসার অমরত্বের গান শোনালেন। এ যেন জীবনের পড়ন্ত বেলার কাছে লেখা প্রেমপত্র। গাবো আজও আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো অসাধারণ স্প্যানিশে, যেটা কোনো দিনই ফুরিয়ে যাওয়ার নয়। একদিন আমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ব, কোনো সন্দেহ নেই যে গাবো আর তাঁর মাকোন্দো তখনো জেগে থাকবেন আবহমানকালের ইন্দ্রজাল হয়ে।

নভেম্বর ২০১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরকম বাজে কিছু করা যাবে না। সরাইখানার
মহিলাটি বুড়ো এগুচিকে সাবধান করে দেয়।
ঘুমন্ত মেয়েটির মুখে আঙুল রাখা কিংবা
ওই জাতীয় কিছু করা যাবে না।

—ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

হাউস অব দ্য স্লিপিং বিউটিস্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বয়স নব্বই পূর্ণ হওয়ার দিন ইচ্ছে হলো উঠতি বয়স্কা কোনো কুমারীকে সারা রাত ধরে পাগলের মতো ভালোবাসি। রোসা কাবার্কাসের কথা ভাবলাম, এক পতিতালয়ের মালিক যে তার ডেরায় নতুন কোনো মেয়ে এলেই খাস কাস্টমারদের খবর দিতে ভুলত না। বহুবার ডাকার পরও রোসার ওই লোভনীয় ডেরায় যাইনি, তার কোনো কুপ্রস্তাবেও সাড়া দিইনি কখনো, যদিও সে আমার এ নৈতিকতাকে থোড়াই পাত্তা দিত। 'সময়ে কোথায় ধুইয়া-মুইছা যাইব এই সব নৈতিকতা,' মুখে এক তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে এমনটা বলত রোসা। সে আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোট ছিল। বহু বছর হয় রোসার কোনো খোঁজখবর রাখিনি, মরে-টরে গেল কি না কে জানে। এ রকম ভাবতে ভাবতে ফোনটা করলাম আর ওই প্রান্তে ফোনটা যে ধরল তার কণ্ঠস্বরটা চিনতে একটুও ভুল হলো না আমার এবং কোনো রকম ভণিতা ছাড়াই রোসার প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বললাম :

'হ্যাঁ, আজই লাগবে।'

সে একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'হায় রে আমার পণ্ডিত, বিশ বছর কোনো খবর ছিল না আর এত দিন পর যোগাযোগ করেই আজব এক আবদার করতাছেন।' মুহূর্তের মধ্যেই তার স্বভাবসুলভ ছল-চাতুরীমার্কা কথাবার্তার ফাঁকে জানাল যে তার ডেরায় অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু তাদের কেউই কুমারী নয়। আমি আবার মনে করিয়ে দিলাম, 'না, আমার কুমারী মেয়ে প্রয়োজন এবং সেটা আজ রাতেই।' সে একটু উদ্বেগজনিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? হইলটা কী? কী প্রমাণট্রমাণ করতে চান?' অহমে একটু লাগল। সেটা চেপে গিয়ে বললাম, 'না, তেমন কিছু না, হঠাৎ ইচ্ছে হলো, আর আমি কোনটা পারি আর কোনটা পরি না, সেটা আমি ভালো করেই জানি।' রোসা একধরনের আবেগশূন্য কণ্ঠে বলল যে 'পণ্ডিতেরা অনেক কিছু জানে, কিন্তু তার মানে এই না যে সবকিছু জানে, সত্যিকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যা রাশির জাতক হইল এই আপনাগো মতো আগস্টে জন্ম নেওয়া কয়েকজন। আমাকে আরও কিছু সময় দেন।' মন যে সেটা মানবে না, তাকে বললাম। 'বরং অপেক্ষাই করেন,' দৃঢ়চিত্ত কণ্ঠে অনেকটা পুরুষদের মতো করে বলে সে এবং জানায় যে ওই রকম কাউকে খুঁজে পেতে দুই দিনও লেগে যেতে পারে। উত্তরে আমি অনেকটা গম্ভীর স্বরে বললাম, 'আমি যে বয়সে এসে পৌঁছেছি, তাতে এখন প্রতিটি ঘণ্টাই আমার কাছে এক বছরের সমান আর তুমি বলছ অপেক্ষার কথা।' 'তাহলে আর কী করা,' দ্বিধাহীন কণ্ঠে রোসা বলে, 'কোনো অসুবিধা নেই, বরং মজাই লাগতাছে, দূর শালা, এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফোন করুম।'

একটা কথা হলো কি, নিজের সম্বন্ধে বেশি কিছু কী বলব, মানুষ হাজার মাইল দূর থেকে দেখলেই বোঝে; আমি দেখতে কুৎসিত, স্বভাবে লাজুক ও সেকেলে। কিন্তু সেগুলোকে এড়িয়ে এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো ঢেকে রেখে আমি ভান করেছি উল্টোটা হওয়ার। কিন্তু আজ হলো কী, আজ ইচ্ছে করছে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু একটা করি, নিজের চেতনায় একটু প্রশান্তি আসুক। আর এই ভাবনা অনুযায়ী প্রথম কাজটা সেরেছি রোসা কাবার্কাসকে ওই অদ্ভুত ফোনটা করার মধ্য দিয়ে। যে বয়সে বেশির ভাগ মানুষই পৌঁছাতে পারে না, মরে যায়, সে বয়সে এসে আমি এক নতুন জীবন শুরু করলাম বলা যায় সেদিন। পেছন ফিরে দেখলে সেটাই মনে হচ্ছে আজ।

সান নিকোলাস পার্কের রাস্তার ধারের এক ঔপনিবেশিক রীতির বাড়িতে থাকি আমি। সেখানটায় আমার সারাটা জীবন কেটেছে নারীসঙ্গবিহীন। ভাগ্যের মুখও কোনো দিন দেখলাম না। এ বাড়িতেই আমার বাবা-মা থেকেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, আর আমিও একা একা এ বাড়িতেই মরার আশা রাখি, সেই একই খাটে শুয়ে, যে খাটে আমার জন্ম, যে খাটে শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি সুদূরের, কোনো রকম দুঃখ ছাড়াই চলে যাব একদিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিলাম করে আমার বাবা এ বাড়িটা কিনেছিলেন। নিচের তলাটা এক ইতালিয়ান লগ্নিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দিয়েছিলেন। ওরা লাইটের দোকান দিয়েছিল। আর এই দ্বিতীয় তলাটা ওই ইতালিয় ব্যবসায়ীদের কোনো একজনের কন্যার সঙ্গে বাকিটা জীবন সুখে-শান্তিতে কাটাবেন বলে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। ফ্লোরিনা দে দিওস কার্গামান্তোস নামের কন্যাটি মোৎসার্টের সুর তুলতে পারত চমৎকার, অনেক ভাষায় কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত। এই শহরে এর আগে এত সুন্দরী ও বিদুষী নারী কখনো বাস করেনি। এই নারী আর কেউ নন, আমার মা।

বাড়িটার পরিবেশ বেশ খোলামেলা, প্রচুর আলো, চুনাপাথরের খিলান, ফ্লোরেন্সের মোজাইক পাথরের কাজ সারা বাড়িতে। চারটা কাচের দরজা দেওয়া একটা লম্বা টানা বারান্দা আছে, যেখানটায় মার্চ মাসের রাতে বসে আমার মা আর তাঁর ইতালিয়ান চাচাতো-মামাতো-ফুফাতো বোনেরা মিলে প্রেমগীত গাইতেন। ওখানে বসলে সান নিকোলাস পার্ক ও তার গির্জা এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মূর্তি দেখা যায়। আরও দূরে চোখ মেলালে চোখে পড়বে নদীবন্দরবর্তী গুদামঘরগুলো এবং বিশাল মাগদালেনা নদীর বিস্তৃত প্রান্তর, এর মোহনার ৬০ মাইল অবধি। বাড়িটার একটাই সমস্যা, দিনের বিভিন্ন সময় একটু একটু করে রোদের তেজ বাড়তেই থাকে। আর সে কারণে দুপুরে সিয়েস্তার সময় আধো-ছায়া আধো-আলোয় একটু আরাম করে ঘুমানোর জন্য সব জানালা বন্ধ করে দিতে হয়। যে বছর থেকে এ বাড়িতে আমি একা হয়ে গেলাম, সেই বত্রিশ বছর বয়সে, আমি ঘর বদলে বাবা-মা যে ঘরটায় থাকতেন, সে ঘরটায় গিয়ে উঠলাম, পাঠাগারের দিকে যাওয়ার পথের দরজাটা খুলে দিলাম, যেটা এত দিন বন্ধ ছিল। অর্থের প্রয়োজনে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করতে থাকলাম, শেষমেশ বইপত্র আর পিয়ানোটা ছাড়া ঘরে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

চল্লিশ বছর ধরে *এল দিয়ারিও দে লা পাস্* নামের পত্রিকায় তারবার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছি। বিশ্বের বিচিত্র খবর মোর্স কোডের মাধ্যমে শূন্য থেকে ধরে খবরগুলোকে দেশীয় ভাষায় গদ্যে সাজিয়ে লেখার কাজ ছিল আমার। আজ আমার হাল একেবারেই খারাপ, ওই অফিসের পেনশনের টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। স্প্যানিশ ও লাতিন ব্যাকরণের শিক্ষক হিসেবে যা পেয়েছি সেটাও যৎসামান্য, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এত খাটাখাটুনি করে যা কিছু লিখেছি, সেটা থেকেও কিছুই আসে না, আর সংগীত ও থিয়েটারবিষয়ক ছুটকাছাটকা কলাম যেগুলো লিখেছি বহুবার বিভিন্নজনের অনুরোধে, সেগুলো থেকে কিছুই পাইনি। লেখালেখি ছাড়া জীবনে আর কিছুই করিনি, যদিও আমি পেশায় লেখকও নই কিংবা লেখক হওয়ার গুণও আমার মধ্যে নেই। রচনা লেখার পদ্ধতিগত নিয়মকানুনকে আমি পুরোপুরি উপেক্ষা করি, আর লেখালেখির মধ্যে নিজেকে যতটুকু জড়িয়েছি, তাও জীবনে যা যা পড়েছি তারই আলোকে। একেবারে অকপটে বলা যায় যে আমি এমন এক চিজ, যার কোনো গুণগান নেই। আমি মরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলে আমার পরিচিতজনদের আমাকে নিয়ে বলার মতো কিছুই থাকবে না। তাই আমি চেষ্টা করছি, আমার অসাধারণ প্রেমের স্মৃতিকথাটা একটু গুছিয়ে লিখে রাখা যায় কি না।

যেদিন আমার বয়স নব্বই পূর্ণ হলো, সেদিনটা আমার শুরু হলো ভোর পাঁচটায়, যেমনটা আমি সব সময় করে এসেছি। দিনটা ছিল শুক্রবার আর কাজ বলতে ছিল কেবল *এল দিয়ারিও দে লা পাস্* পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার লেখাটা লিখে ফেলা। ভোর হতে না-হতেই আমার যেসব সমস্যা দেখা দিল, তাতে আর ভালো বোধ করার কোনো কারণ ছিল না। সেই ভোর থেকেই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গিঁটে গিঁটে ব্যথা করছিল, পাছা জ্বালা করছিল, আর প্রায় তিন মাস খরার পর জোর ঝোড়ো বাতাস বইছিল। কফি খেলাম, গোসল সারলাম, মৌমাছি পড়ে আছে এ রকম মিষ্টি মধু লাগানো একটা পেয়ালা নিলাম, সঙ্গে দুই টুকরা রুটি।

ওই দিনের একমাত্র খবর হলো, আমার নব্বইতম জন্মদিন। বয়স নিয়ে কোনো দিনই ভাবিনি, কিন্তু বয়স এমন যে আপনাকে জানান দেবেই, যেমন করে ঘরের ছাদের ফুটো জানিয়ে দেয় যে ঘরের বয়স হয়েছে, আর কত দিন! সেই ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, কেউ মারা গেলে তার চুলে যে উকুনগুলো বাসা বেঁধেছিল, সেগুলো ভয়ে গুটিসুটি মেরে মাথা ছেড়ে বালিশের তলায় গিয়ে লুকায়, ওই মৃত ব্যক্তির পরিবারের কেউ না আবার দেখে ফেলে এই লজ্জায়। এটা আমাকে সৌভাগ্যক্রমে এমন একটা জিনিস শিখিয়েছিল যে স্কুলে যাওয়ার সময় চুলে নারকেল তেল দেওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর অল্পবিস্তর চুল যা-ও এখনো মাথায় আছে, সেটা ধুই সাবান দিয়ে। বলতে চাইছি, মৃত্যুর বোধের চেয়ে বরং সামাজিক ক্ষমতা সম্পর্কেই সম্যক ধারণা আমার সেই ছোটবেলা থেকে।

কয়েক মাস ধরেই ভাবছিলাম যে নব্বইতম জন্মদিনে ফেলে আসা দিনগুলোর জন্য কোনো হা-পিত্যেশ করে দিনটাকে নষ্ট করব না, বরং উল্টো এই যে বৃদ্ধ হলাম, সেটাকে ঘিরে আনন্দ করা যায় কি না সেটাই দেখব। প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি যে বৃদ্ধ হয়েছি সেই বোধটা আমার ভেতর কবে থেকে জন্ম নিল এবং উত্তরে দেখলাম, নব্বইতম জন্মদিনের মাত্র দিন কয়েক আগে থেকে এই বোধটা আমার ভেতর বাসা বেঁধেছে। মনে পড়ে, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে কাঁধের এক ব্যথার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং ডাক্তার দেখিয়েছিলাম এ কারণে। কিন্তু ডাক্তার অসুখটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। বরং উল্টো আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, এ বয়সে এ রকম একটু-আধটু ব্যথা হবেই, এটা স্বাভাবিক।

'তাহলে তো বলতে হয়,' ডাক্তারকে বললাম, 'অস্বাভাবিক ব্যাপারটা হলো আমার বয়স।'

ডাক্তার সাহেব কেমন একটু ব্যথাতুরভাবে হাসলেন। 'আপনি তো দেখছি মশাই দার্শনিক,' ডাক্তার আমাকে বললেন। সেই বেয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রথম বার্ধক্য নিয়ে ভেবেছিলাম, কিন্তু অচিরেই সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে এতগুলো বছর প্রতিদিনই শরীরের কোনো না কোনো অংশের ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে উঠছি। কখনো কখনো তো মনে হয়েছে, এই বুঝি মরণব্যথা, কিন্তু দেখা গেছে, তার পরদিনই ব্যথাটা চলে গেছে। ওসব দিনে কারও চেহারা যদি তার বাবার মতো হতে শুরু করল, তো অমনি বলা হতো যে ওটা তার বয়সের লক্ষণ। সেই মোতাবেক তো আমি সারা জীবনই তরুণ রইলাম। কেননা, আমার ঘোড়া মার্কা চেহারায় আমার বাবার রুক্ষ ক্যারিবীয় কিংবা আমার মায়ের চমৎকার ইতালীয় আদল কখনোই ছিল না, আজও নেই। আসল ব্যাপারটা হলো এই যে আমার মধ্যে বয়সের ছাপজনিত কোনো পরিবর্তন এলেও সেটা এতই ধীরগতিতে হয়েছে যে লক্ষই করা যায়নি। আমার ভেতর থেকে দেখলে আমি তো সেই আমিই আছি, পরিবর্তন কিছু হয়ে থাকলে সেটা বলতে পারবে অন্যরা।

বয়স পঞ্চাশ-এর কোঠায় আসার পর বার্ধক্য নিয়ে প্রথম ভাবা শুরু করলাম, যখন অনুভব করলাম আস্তে আস্তে খেয়াল কেমন ছুটে যাচ্ছে। তন্ন তন্ন করে সারা বাসায় খুঁজেও চশমাজোড়া যখন পেতাম না, ঠিক তখনই দেখা যেত ওগুলোকে কোথাও রেখেছি, গোসল করতে গিয়ে বাথরুমে রেখে এসেছি কিংবা হয়তো কিছু একটা পড়তে গিয়ে যে চোখে দিয়েই বসে আছি, সে খেয়ালই নেই। একদিন তো দুবার নাশতা করলাম, একবার যে করেছি সে খেয়ালই ছিল না দ্বিতীয়বার। বন্ধুরা সতর্ক করে দিয়ে জানাল, ওদের নাকি একই গল্প গেল সপ্তাহেও একবার বলেছি। মাথার মধ্যে একগাদা পরিচিত মুখের ছবি ছিল, আর কিছু ছিল যাদের নামে চিনতাম, কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হলে তো খেয়াল ছুটে যেত; মুখের সঙ্গে নামের আর নামের সঙ্গে মুখের ছবি গুলিয়ে ফেলতে শুরু করলাম। কার নাম যে কী সেটা মনে করতে একটু সময় লাগত।

যৌবন নিয়ে আমার কখনোই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কারণ আমার যৌনশক্তির ব্যাপারটা ঠিক আমার চেয়েও আমার সঙ্গিনীদের ওপর নির্ভর করত বেশি আর ওরা ভালো করেই জানে কীভাবে কখন ওটাকে চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। আশি বছরের যেসব বালক এই ব্যাপারটার একটা সমাধান খুঁজতে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়, তাদের কথা ভাবলে আমার হাসি পায়, নব্বই বছর বয়সে পৌঁছালে ওরা করবেটা কী! কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না; বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কত কিছু করতে হয়। বরং বলা যায়, বার্ধক্যে এসে জীবনটা এটা অর্জন করে যে এই বয়সে এসে অনেক কিছুর খেয়াল ছুটে যায়, যার অনেকাংশই অতটা জরুরি নয় মনে রাখা। কিন্তু ওই বয়সে এসে অবস্থাটা এমন খুব কমই হয় যে আমাদের জীবনের যেসব সত্য জানতে আমরা আগ্রহী, সেগুলো আমরা মনে করতে পারি না। রোমান প্রাজ্ঞ সিসেরো কলমের খোঁচায় তুলে ধরেছিলেন : *এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে তার ধন-সম্পদ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা বার্ধক্যে এসে ভুলে যায়।*

ঠিক এই রকম ও অন্যান্য নানা বিচিত্র চিন্তাভাবনার আলোকে প্রথম কিস্তিটা যখন লেখা শেষ, তখন আগস্টের সূর্য তার তাপ ছড়াতে শুরু করেছে পার্কের বাদামগাছ আর নদীর বুকে ভাসমান চিঠিপত্রে বোঝাই নৌকার গলুইয়ের ফাঁকে। খরার কারণে এক সপ্তাহ বিলম্বে আসা চিঠিবোঝাই নৌকাটি বন্দরের সংকীর্ণ নালিপথে হাঁকডাক তুলে ভিড় করল। আমি ভাবলাম, এভাবেই আমার বয়স নব্বই-এ গিয়ে ঠেকল। দ্বিধা-ভাবনা ব্যতিরেকে ভণিতা বাদ দিয়ে সেই চেপে বসা স্মৃতি-জাগানিয়া মুহূর্তের যোগসাজশেই বুঝি রেগা কাবার্কাসকে ফোন করে বললাম, আমার নব্বইতম জন্মদিনে এক বিশেষ রাত কাটাতে চাই আর সে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে কি না। বয়স হওয়া সত্ত্বেও শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকে বহু বছর ধরেই আমি প্রশান্তির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। মূলত, আগে পড়া ধ্রুপদি সাহিত্যের এটা-ওটা আবার পড়ে আর উচ্চমার্গীয় সংগীতের কনসার্টে যাওয়া-আসার মধ্যেই আমার দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ওই দিন কী যে হলো, আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী না হয়ে পারলাম না। মনে হচ্ছিল, এ যেন খোদার তরফ থেকে আসা কোনো তারবার্তা। আর ফোনটা করার পর থেকে আর কোনো কিছু লিখতে পারছিলাম না। হ্যামাকটা পাঠাগারের এক কোণে ঝুলিয়ে রাখা ছিল, যেখানটায় দিনের বেলা সূর্যের আলো পড়ে না। পেটটাকে ঝুলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। অপেক্ষায় আর তর সইছিল না।

আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে বহুমুখী প্রতিভাধর এক মায়ের আশ্রয়ে, কিন্তু বয়স পঞ্চাশ-এর কোঠায় পৌঁছার পর মা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর ছিলেন প্রথানুগামী বাবা, যিনি কোনো রকমের ভুলত্রুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে নিতে পারতেন না। বিপত্নীক বাবার শয্যায় মৃত্যুর ডাক এল এমন একদিন, যেদিন নেএর্লান্দিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর হয়, আর এই চুক্তির মাধ্যমে এক হাজার দিনের যুদ্ধসহ পূর্ববর্তী শতাব্দীর অসংখ্য গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। শান্তিচুক্তির পর শহরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এল, যেটা আগে থেকে কেউ চিন্তা করেনি বা আশাও করিনি। আলুচা সড়কের পুরোনো সব খাবারের দোকানে অসংখ্য স্বাধীনচেতা নারী ভিড় করতে লাগলেন, পরবর্তী সময়ে এ সড়কটির নাম হয় আবেয়ো এবং আরও পরে আজ রাস্তাটির নাম কোলোন বা কলম্বাস এভিনিউ। আমার প্রাণে এই শহর নিরন্তর বিদ্যমান, যে শহরের মানুষের মধুময় স্বভাব আর তার নির্মল আলো কাছের ও দূরের সবাইকে কাছে টেনে নেয়।

পয়সা না দিয়ে কোনো দিনই কারও সঙ্গে রাত কাটাইনি। আর মাঝেমধ্যে এমন যখন হয়েছে যে, যার সঙ্গে রাত কাটালাম বেশ্যাবৃত্তি তার পেশা নয়, তখন তাকে যুক্তি দিয়ে বা যেভাবেই হোক বুঝিয়েছি যে পয়সাটা তাকে নিতেই হবে, এরপর সে পয়সাটা ডাস্টবিনে ফেলে দিক বা যা-ই করুক। আমার বয়স যখন বিশ বছর, তখন একটা খাতা নিয়ে আমার এজাতীয় নৈশকালীন কর্মকাণ্ডের কথা লিখতে শুরু করলাম এক নোটবইয়ে; শয্যাসঙ্গিনীর বয়স, নাম, গ্রাম, কোথায় রাত কাটালাম, কেমন করে কী হলো তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বয়স যখন পঞ্চাশে গিয়ে ঠেকল, তখন গুনে দেখা গেল, মোট ৫১৪ জন নারীর নাম পাওয়া যাচ্ছে ওই নোটবইয়ে আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্তত একবার করে হলেও রাত কাটিয়েছি। মাঝেমধ্যে শরীরে যখন আর সইত না, সে রকম অনেকবার আর টুকে রাখা হয়নি আর কাগজের নথি ছাড়াই দেখলাম যে সবকিছু বলতে পারছি। আমার নিজস্ব একটা নিয়মনীতি মেনে চলতাম এ ক্ষেত্রে। দল বেঁধে কখনো কিছু করতে যাইনি কিংবা জনসমক্ষেও কিছু করিনি কখনো, গোপন কথা কারও সঙ্গে বলতেও যাইনি কিংবা কাউকে রসিয়ে শরীর বা সত্তার গল্পও শোনাইনি। সেই তরুণ বয়স থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে কেউই অপরাধের শাস্তির বাইরে নয়।

একটু অন্য রকমের একমাত্র যে সম্পর্কটা বহু বছর ধরে আমি বজায় রেখেছিলাম, সেটা ছিল অসম্ভব রকমের বিশ্বাসী দামিয়ানার সঙ্গে। দামিয়ানা বলতে গেলে ছিল একেবারে বালিকা, আদিবাসী ইন্ডীয় জাতের, বেশ শক্তমক্ত ও পাহাড়ি। কথাবার্তা তেমন কিছুই বলত না, এমনকি আমি যখন লিখতাম তখন না জানি আবার আমার মনোযোগ নষ্ট হয়, সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবে খালি পায়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করত। মনে পড়ে, করিডরে হ্যামাকে শুয়ে আমি *লা লোসানা আন্দালুসা* পড়ছিলাম এবং হঠাৎ একটু করে খেয়াল করলাম, লন্ড্রি ঘরে একটু হেলান অবস্থায় সে, পরনের স্কার্টটা এতটাই ছোট ছিল যে তার মাংসল উরুর অনেকখানিই দেখা যাচ্ছিল। এক অদ্ভুতুড়ে জ্বরের প্রকোপে ওকে কোলে তুলে নিয়ে গেলাম পেছনে, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত জামাটাকে নামিয়ে পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরলাম। 'আহ্, সেনিয়োর,' সে বলল, বিষণ্ন এক গোঙানিসহ, 'এ রকম করবেন না।' এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব হলো তার শরীরে, কিন্তু ও সটান হয়ে ছিল। হঠাৎ করে এভাবে তাকে অপদস্থ করার অনুশোচনায় তাকে ওই দিন অন্য দিনের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা দিতে চাইলাম, যদিও এমনিতেই ওর রেট ছিল বেশ চড়া। কিন্তু ও সেটা গ্রহণ করল না এবং অগত্যা আমি ওর বেতন বাড়িয়েছিলাম মাসে একটা বোনাস যোগ করে। ও আমার কাপড়চোপড়ও ধুয়ে দিত।

মাঝে একবার ভেবেছিলাম যে বিছানায় রাত কাটানোর এসব কাহিনি হয়তো একদিন আমার ফেলে আসা জীবনের দিনগুলোর দুঃখ-দুর্দশার চালচিত্র হবে আর এ রকম ভাবতে ভাবতেই একদিন মাথার মধ্যে এক শিরোনাম এসে হাজির: 'আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা'। বাইরের জনসমক্ষে আমার জীবনটা বলতে গেলে কৌতূহলোদ্দীপকই ছিল; পিতা-মাতার এতিম সন্তান, ভূত-ভবিষ্যৎহীন এক ব্যাচেলর, মাঝারি মানের সাংবাদিক, কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসের হুয়েগোস ফ্লোরালেস উৎসবের চার-চারবারের ফাইনালিস্ট আর তার সঙ্গে কুৎসিত চেহারা-সুরতের কারণে কার্টুনিস্টদের কাছে আমার আকর্ষণই অন্য রকম ছিল। সোজাসাপ্টাভাবে বলতে গেলে, হারিয়ে যাওয়া এক জীবন, যার সূচনা সেই সন্ধ্যা থেকে, যে সন্ধ্যায় মা আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন *এল দিয়ারিও দে লা পাস্* পত্রিকার অফিসে, এই অভিপ্রায়ে যে তাঁর ছেলে স্প্যানিশে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় পাণ্ডিত্য করতে গিয়ে যা লিখেছে সেটা ছাপানো হবে। বেশ ঘটা করে রবিবাসরীয় সংখ্যায় পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের ভূমিকাসহ ছাপা হয়েছিল সেটা। অনেক বছর পর জেনেছিলাম যে মা আমার সেই সংখ্যাসহ পরপর আরও সাতটি সংখ্যার জন্য পত্রিকাওয়ালাদের টাকা দিয়েছিলেন আমার লেখাটি ছাপানোর জন্য। কিন্তু এটা জেনেও আমার কোনো অপমানবোধ বা ওই জাতীয় কিছু হয়নি, কেননা তত দিনে আমার সাপ্তাহিক ওই কলাম তার নিজস্ব ডানায় ভর দিয়ে পাখা মেলা শুরু করেছে আর তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া তত দিনে আমি পত্রিকা অফিসটির টেলিগ্রাফ অপারেটর এবং সংগীতবিষয়ক সমালোচক হিসেবেও কাজ শুরু করেছি।

চমৎকার রেজাল্টসহ ব্যাচেলর ডিপ্লোমাটা পাওয়ার পর একই সঙ্গে তিনটি সরকারি কলেজে স্প্যানিশ ও লাতিন ভাষার অধ্যাপনা শুরু করলাম। শিক্ষক হওয়ার কোনো রকম ট্রেনিং আমার ছিল না। সুতরাং ওই হিসেবে আমি ছিলাম বাজে এক শিক্ষক। অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়াতাম আর ঘরে পিতা-মাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্কুলে আসা ওই ছেলেপুলেদের প্রতিও কোনো রকম মায়া-দয়া দেখাতাম না। একটা জিনিসই করতাম ক্লাসে আর সেটা হলো, আমার কাঠের রুলারটা নেড়ে নেড়ে ওদের শাসাতাম আর বলতাম আমার সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে আবৃত্তি করতে আমার প্রিয় কবিতাখানি : *এই সব, ফাবিয়ো, কী বেদনা, এখন কী দেখো, নিঃসঙ্গতার খেত, কী বেদনাবিধুর খেত, একদা ছিল বিখ্যাত ইতালিকা কাল ...*। বহু বছর পর বার্ধক্যে এসে আমার হঠাৎ করে মনে হলো, ছাত্রছাত্রীরা আমাকে ভেঙিয়ে আমার কাঁধে একবার লিখে রেখেছিল : 'অধ্যাপক বেদনাবিধুর'।

এই ছিল মোটামুটি আমার জীবন এবং এর বাইরে আর কিছুই করিনি। ক্লাসের ফাঁকে দুপুরের আহারটা সেরে নিতাম, রোজ সন্ধ্যা ছয়টায় পত্রিকার অফিসে গিয়ে হাজির হতাম আর মোর্স কোডের মাধ্যমে তারবার্তা সংগ্রহ শুরু করতাম। রাত ১১টায় পরের দিনের পত্রিকার জন্য সবকিছু যখন গোছগাছ ঠিক, তখন শুরু হতো আমার আসল জীবন। প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন রাত কাটাতাম চীনা টাউনের বেশ্যাপাড়ায়, একেক দিন একেক কোম্পানির খদ্দের হয়ে। এ রকম দুবার তো বছরের সেরা কাস্টমার খেতাবও পেয়েছিলাম। রাতের আহারটা সারতাম কাছের রোমা ক্যাফেতে। খাবারটা খেয়েই ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটতে হাঁটতে যেটা চোখে পড়ত সে বেশ্যালয়েই ঢুকে যেতাম পেছনের দরজা দিয়ে গোপনে। এ রকমটা করতাম ভালো লাগত বলে। পরবর্তী সময়ে একদিন টনক নড়ল যে এসব জায়গায় হোমরাচোমরা রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই আসেন আর সঙ্গমকালে তাদের শয্যাসঙ্গিনীদের আদর করে বেফাঁসে রাষ্ট্রের বহু গোপন কথা বলে বসে থাকেন আর এক ঘর থেকে আরেক ঘরের মধ্যে আড়াল বলতে এমন এক পাতলা বোর্ড যে একটু কান পাতলেই পাশের ঘরের সব কথাবার্তা শোনা যায়। ঠিক একইভাবে কানে এল আমার উদ্দেশ্যহীন কুমারজীবনের সঙ্গে মেলান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিমেন সড়কের এতিম বালকদের সমকামিতার গল্পটা। ভাগ্য ভালো যে আমি ব্যাপারটা ভুলে গেলাম। আমার সম্পর্কে ওরা ভালো কিছুও বলেছে, কথাগুলো মূল্যবানও বটে।

খুব ভালো বন্ধু বলতে যেটা বোঝায় সে রকম কোনো বন্ধু কখনোই ছিল না আমার। যা কয়েকজন বন্ধু বা ছিলও, তারা সবাই নিউইয়র্কে মরে ভূত। হয়তো তাদের আত্মা ওখানে হাহাকার করছে তাদের অতীত জীবনে আর ফেরা হলো না বলে। অবসর নেওয়ার পর থেকে আমার আর তেমন কিছুই করার রইল না, শুধু প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় পত্রিকা অফিসে লেখাটা নিয়ে যাওয়া ছাড়া। মাঝেমধ্যে এটা-ওটা করি, এখানে-ওখানে যাই: চারুকলায় কনসার্ট, শিল্পকলা কেন্দ্রের জন্মলগ্ন সদস্য যে আমি। নানা রকম জনসাধারণমুখী কল্যাণমূলক সংস্থার কনফারেন্স কিংবা অ্যাপোলো থিয়েটারে কোনো বিশেষ সপ্তাহ—এসবেও যাওয়া পড়ে। সেই তরুণ বয়স থেকেই ছাদ নেই, এ রকম সিনেমা হলে যাচ্ছি সিনেমা দেখতে। সিনেমা দেখতে দেখতে মাথার ওপর আকাশে ফকফকে জ্যোৎস্না উঠল কিংবা আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল আর এমনই বৃষ্টির তাণ্ডব যে নিউমোনিয়া হওয়ার জোগাড়। কিন্তু সিনেমা দেখার চেয়ে আমার আকর্ষণটা ছিল শুধু টিকিটের মূল্যে বা অনেক সময় পয়সা ছাড়াই বা শুধু বিশ্বাসের বশে যেসব রাতের পাখি সঙ্গে নিত তাদের ঘিরে। সিনেমা ঠিক আমার বিষয় নয়। শার্লি টেম্পল পর্যন্তই আমার দৌড়।

জীবনে মাত্র চারবার ঘুরতে গেছি কোথাও, তা-ও কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসের ফুল খেলা উৎসবে। আমার বয়স তখনো ত্রিশ হয়নি। ওখানে মোটরলঞ্চে চেপে এক রাতে গিয়েছিলাম সাক্রামেন্তো মোন্তিয়েলের নিজস্ব বেশ্যালয়ে, সান্তা মার্তায়, তারই নিমন্ত্রণে। গার্হস্থ্য-জীবনে আমি খাওয়াদাওয়া করি খুব কম—আর যেটা দেওয়া হয় সেটাই খাই। দামিয়ানা যখন বুড়িয়ে গেল তখন থেকে রান্না বন্ধ, আর তখন থেকে আমি ওই ক্যাফে রোমায় গিয়ে আলু, ডিম ভাজি খাই রোজ রাতে পত্রিকা অফিসের কাজের পর।

এভাবে আমার দিন কাটছিল এবং নব্বইতম জন্মদিনের প্রাক্কালে হলো কি, দুপুরে কিছু খেতে পারছিলাম না। বই পড়তে বসেও দেখলাম পড়া হচ্ছে না, মাথায় কেবল রোসা কাবার্কাসকে ফোন করার চিন্তাটা ঘুরছিল। কাঠফাটা রোদে দুপুর দুইটায় বাইরে মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি আর খোলা জানালায় রোদের তেজে অতিষ্ঠ হয়ে তিনবার আমাকে জায়গা বদল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হলো হ্যামক দোলনায়। সব সময়ই আমার কেন যেন মনে হয়েছে, প্রতিবছর আমার জন্মদিনে বছরের সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। অনেকটা অভ্যস্তই হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনটা কেমন যেন একটু অন্য রকম ছিল, কিন্তু কেন সেটা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। বিকেল চারটার সময় নিজেকে একটু শান্ত করার অভিপ্রায়ে হুয়ান সেবাস্টিয়ান বাখের 'সিক্স স্যুটস ফর চেল্লো'র সুর শোনার চেষ্টা করলাম বিখ্যাত পাবলো কাসালসের বাজনায়। আমার বড় পছন্দের সেরা সুর ওটা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রশান্তির বদলে কেমন যেন দুর্বলতা বোধ করা শুরু করলাম। রেকর্ডের দ্বিতীয় ট্রাকটা ছেড়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। একটু তন্দ্রামতো এল। এবং স্বপ্নে ওই চেল্লোর গোঙানি ভেসে এল আবার আর দেখলাম, এক দুঃখবোঝাই নৌকা ভেসে গেল। ঠিক তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল এবং রোসা কাবার্কাসের গেঁয়ো কণ্ঠস্বরে আমি জীবন ফিরে পেলাম। 'আপনার ভাগ্যটা ভালো,' সে বলে। 'একটা মাইয়ার খোঁজ পাইছি, একেবারে কচি, আপনি যা চাইছেন তার চেয়েও ভালা। কিন্তু ঘটনা হইল, ওর বয়স ঠিক চৌদ্দও হয় নাইকা, মুসিবতটা এডাই।'

'বাচ্চা হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই,' আমি খুশি মনে বললাম। রোসার এ রকম বলার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে সেটা না ভেবেই। 'না, আপনার জন্য বলছি না, মুসিবতটা তো আমার,' সে বলে 'একবার জেলে ভইর‍্যা দিলে তিন বছর থাকতে হইব...হেইডার পয়সা কে দিব?'

কেউই এই পয়সা দিতে যাবে না, আর ও তো নয়ই! রোসার ওইখানে যেসব মেয়ে আছে, তারা একেবারে অল্প বয়সে কাজ শুরু করে ওর ডেরায় এবং তাদের থেকে রোসা পয়সা নেয়, কারণ ওর জায়গায় ওরা উপার্জন করছে আর ওর জন্য এটা ব্যবসা এবং এরা একসময় রোসাকে দিতে দিতে ফতুর হয়ে বেশ্যা হিসেবে ঐতিহাসিক এই বেশ্যালয় নেগ্রা ইউফেনিয়ার অযাচিত জীবন বেছে নেয়। রোসাকে কোনো দিন কোনো দণ্ড দিতে হয়নি। কেননা ওর ডেরায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনেক বিশিষ্টজনেরই আনাগোনা, একেবারে গভর্নর থেকে শুরু করে মেয়র অফিসের সাধারণ কেরানি পর্যন্ত। সুতরাং নেগ্রা ইউফেনিয়া বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনির কোনো রকম সমস্যা যে হবে না, সেটা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং তার ওই সব নীতিগত কারণ দর্শানোর মানে হলো, কাস্টমারের কাছ থেকে এই সুযোগে বেশি পয়সা বাগিয়ে নেওয়া; শাস্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাত্রা যত, রেটও তত বেশি। শেষমেশ ঠিক হলো, এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য ওকে আরও দুই পেসো বাড়িয়ে দিতে হবে এবং ঠিক রাত ১০টায় আমি তার ওখানে উপস্থিত হব পাঁচ পেসো অগ্রিমসহ। ১০টার ঠিক এক মিনিট আগে গেলেও কাজ হবে না, কেননা বালিকা মেয়েটি তার ছোট ভাইবোনদের খাইয়েদাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রিউম্যাটিক আক্রান্ত মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তারপর আসবে।

আর চার ঘণ্টা বাকি। কী সব ভাবতে ভাবতে আমার বুকের ধড়ফড়ানি বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হলো যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে। কী কাপড় পরে যাই, সেটা নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময় পার করার দুর্বার চেষ্টা করলাম। না, নতুন আর কী পরব, আগে যা পরতাম তা-ই। দামিয়ানা বলত যে আমি যেভাবে কাপড় পরি তাতে নাকি আমাকে বিশপের মতো দেখায়। একেবারে ছোট একখানা ছুরি দিয়ে একটু চুল-দাঁড়ি কাটলাম। রোদের তেজে গোসলখানায় পানি একেবারে গরম হয়ে ছিল, অপেক্ষা করলাম একটু ঠান্ডা হোক। গোসল সেরে তোয়ালে দিয়ে গা মোছার সময় মনে হলো, নতুন করে ঘামছি। রাতের প্রহরের সঙ্গে মিলিয়ে কাপড় পরলাম, সাদা লিনেনের কোট, নীল ডোরাকাটা শার্ট, চীনা সিল্কের টাই, জিংক পাউডার দিয়ে নতুন করে সাফ করা কেডজোড়া, সোনালি ঘড়ি আর সেটার মাথায় সিংহমূর্তির একটা ছোট্ট চাবি। শেষে প্যান্টটা একটু টেনে ফিটফাট করে পরলাম, যাতে আমাকে দেখে কেউ না বোঝে যে আমি কয়েক ইঞ্চি কমে গেছি।

আমি যে মিসকিনের মতো চলাফেরা করি সেটা সবাই জানে, যদিও আমার বাড়ি দেখে সেটা বোঝার কোনোই উপায় নেই, কিন্তু আসল ঘটনা হলো, ও রকম রাত কাটানোর পেছনে যে খরচ, সেটা আসলেই আমার যৎসামান্য সঞ্চয়ের ওপর রীতিমতো জুলুম। বিছানার নিচের টাকা রাখার ট্রাংক থেকে দুই পেসো নিলাম রুম ভাড়া হিসেবে, চার পেসো দিতে হবে বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনিকে, তিন পেসো মেয়েটির জন্য আর পাঁচ পেসো নিলাম রাতের আহার ও আনুষঙ্গিক খরচ যদি লাগে সে জন্য। সব মিলিয়ে মোট চোদ্দ পেসো, যেটা প্রতি মাসে পত্রিকা অফিস থেকে পাই ওই রবিবাসরীয় লেখাটির জন্য। একটা ছোট ব্যাগের ভেতর পয়সাগুলো ভরলাম, গায়ে ল্যানম্যান অ্যান্ড কেম্প-বার্কলে অ্যান্ড কোম্পানির আগুয়া দে ফ্লোরিদা পারফিউমের বোতল থেকে একটু খুশবু ছড়ালাম। এরপর কেমন একটা ভয় গ্রাস করল। ঘড়িতে আটটা বাজার পর প্রথম সিঁড়ি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামলাম ভয়ে ভয়ে, পা টিপে টিপে, এরপর রাতের কোলে হাঁটা দিলাম ঘর ছেড়ে।

বেশ বাতাস দিচ্ছিল। পাসেয়ো কোলোনে একদল জড়সড় হয়ে প্রায় চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ফুটবল নিয়ে আলোচনা করছিল, আশপাশে অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ফুল ধরে আছে এ রকম এক *মাতার্‌রাতোন* গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পিতলের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল কয়েকজন। নোতারিওস সড়কের কাছে রাস্তায় খদ্দের খুঁজে বেড়াচ্ছিল এক অতিগরিব বেশ্যা, আমাকে দেখে সিগারেট চাইল বরাবরের মতো, আর আমিও বরাবরের মতো উত্তর দিলাম, প্রায় তেত্রিশ বছর দুই মাস সতেরো দিন হয় সিগারেট ছেড়েছি। এল আলামব্রে দে ওরো নামের বিশাল দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নিজেকে দেখলাম ওদের ঝকঝকে ডিসপ্লে জানালায়, ঠিক কেমন বোধ করছিলাম সেটা খেয়াল করিনি, কিন্তু নিজেকে বেশ বুড়ো বুড়ো লাগছিল আর পোশাকটাও কেমন হতদরিদ্র।

রাত ১০টার একটু আগে ট্যাক্সি নিলাম এবং ট্যাক্সিচালককে বললাম আমাকে ইউনিভার্সাল কবরস্থানের ওখানটায় নিয়ে যেতে, আমি ঠিক চাইছিলাম না ও জানুক যে আমি কোথায় যাচ্ছি। সামনের লুকিং গ্লাসে কৌতুকের সঙ্গে তাকিয়ে আমাকে সে বলে, 'আর যা-ই হোক, আমি বেশ ভালোভাবে জিন্দা আছি, যেমনটা আপনি আছেন। স্যার, দয়া করে আমাকে ভয় দেখিয়েন না, এবং ঈশ্বর আমাদের দুজনকেই ভালোমতো বাঁচিয়ে রাখুক।' কবরস্থানের কাছে এসে দুজনই একসঙ্গে নামলাম, কারণ তাঁর কাছে ভাঙতি ছিল না। সুতরাং লা তুম্বায় আমাদের পয়সা ভাঙাতে হলো। আদিবাসী ইন্ডিয়দের একটি খাওয়ার দোকান এই লা তুম্বা, ভোরবেলায় এখানে দেখা যায়, সব মাতাল একত্র হয়ে তাদের মৃত আত্মীয়-পরিজনের জন্য কান্নাকাটি করছে। ট্যাক্সি ভাড়া মিটমাট হওয়ার পর ট্যাক্সিচালক একটু গম্ভীর মুখে আমাকে বলে, 'সাবধানে থাকবেন, নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন, মশাই, রোসা কাবার্কাসের ডেরায় আগের অবস্থা আর নেই।' ওকে ঠিক ধন্যবাদ দেওয়ার সুযোগও পেলাম না, আর সবার মতো বুঝলাম যে এই আসমানের নিচের এমন কিছু নেই, যেটা এই পাসেয়ো কোলোনের গাড়িচালকদের কাছে অজানা।

হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা এলাকায় ঢুকলাম, যেখানে আমার বয়সী প্রায় কাউকেই চোখে পড়ল না। এখানে রাস্তাগুলো বেশ চওড়া ও বালুকাময়, বাড়িঘরগুলোর দরজা খুলে রাখা, দেয়ালের পলেস্তারা পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে, ছাদের ওপর খেজুরগাছগুলো কেমন মরা মরা আর উঠোন প্রায় পরিত্যক্ত গোছের। কিন্তু এলাকার মানুষ শান্তিতে আছে বলে মনে হয় না। প্রায় সব বাড়িতেই দেখলাম চলছে সপ্তাহান্তের উদ্দাম পার্টি, ঢাক-ঢোলের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আমি একটু দ্রুত লয়ে হাঁটা দিলাম ওই পার্টি-পাগল উদ্দাম নৃত্যরত মানুষের ভিড়ের পাশ দিয়ে। কেউই ঠিক আমার দিকে তাকাল না একমাত্র এক মুলাটো ছাড়া, যে এক বাড়ির দরজার কাছে বসে ঝিমাচ্ছিল।

'আদিয়োস, ডক্টর,' প্রাণপণে চিল্লিয়ে বলল সে, 'শুভ সঙ্গম।'

তাকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আমার আর কীই-বা করার ছিল? হাঁটতে হাঁটতে প্রায় তিনবার থামলাম একটু দম নেওয়ার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত গন্তব্যের কাছাকাছি ঢালু রাস্তায় এসে পৌঁছালাম। ওখান থেকে আকাশের বিশাল তামাটে চাঁদটা চোখে পড়ল, দূরে প্রান্তরে জেগে উঠছে। একই সঙ্গে আমার পেটের ভেতরের এক জরুরি ডাকে আমি গন্তব্যাভিমুখে ছুট লাগালাম। কিন্তু অনেকক্ষণ সময় নিল। রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে যেখানটায় পাড়ার বাড়িঘর শেষ হয়ে ফলের গাছগাছালি শুরু হয়েছে, সেখানটায় রোসা কাবার্কাসের দোকানে গিয়ে ঢুকলাম।

রোসা অনেক বদলে গেছে। সবচেয়ে সাবধানী বেশ্যালয় সর্দারনি ছিল সে, বিশাল সাইজের যে মহিলাকে আমরা একসময় ফায়ার ব্রিগেডের মহিলা সার্জেন্ট বানাতে চেয়েছিলাম তার বিশালাকৃতির শরীর ও খদ্দেরদের শরীরের আমন্ত্রণ নেভানোর সুচারু ক্ষমতার কারণে। সেই রোসার শরীর-স্বাস্থ্য কমে অর্ধেক হয়ে গেছে নিঃসঙ্গতার দোষে। গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে আর কণ্ঠস্বর এমন তীক্ষ্ণ যে মনে হয় ও এক বাচ্চা বুড়ি। একসময় তার একপাটি ঝকঝকে দাঁত ছিল, এখন দেখি এক দাঁতে সোনার ব্র্যাকেট বসানো, যেটা বের করে সে রঙ্গরস করে। প্রায় পঞ্চাশ বছর একসঙ্গে বসবাসের পর তার স্বামী মারা যায়, দুঃখটা আরও বেড়ে যায় যখন তার একমাত্র পুত্র মারা গেল, যে পুত্রকে শোকে-দুঃখে সে আগলে রাখত। কিন্তু বুকে এসব দুঃখ চেপে রোসা চালিয়ে যাচ্ছে তার ব্যবসা। তার চোখগুলো এখনো আগের মতোই, স্বচ্ছ ও নিষ্ঠুর একজোড়া চোখ, ওই চোখগুলো দেখে আমার মনে হলো, না, তার চরিত্র আগের মতোই আছে, কিছুই বদলায়নি।

রোসার ওই দোকানে আলমারিতে বিক্রি করার মতো তেমন কিছুই দেখলাম না। কিংবা তার মূল ব্যবসা-সম্পর্কিত কোনো কিছুও চোখে পড়ল না ওই দোকানে। রোসা কাবার্কাস এক খদ্দেরের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, আমি যখন চুপিসারে গিয়ে ঢুকলাম সেখানটায়। সে আমাকে দেখেই চিনতে পারল, নাকি না চেনার ভান করল, আমার হাল দেখে সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। অগত্যা বসে রইলাম পাশের বেঞ্চিতে, যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার কথাবার্তা শেষ হয়। বসে বসে ভাবছিলাম পুরোনো দিনের কথা, কেমন ছিল রোসা একসময়, সে কথা। যদ্দুর মনে পড়ে, দুবারেরও বেশি, আমরা দুজনই তখন অনেক শক্ত-সামর্থ্য, আমাকে আমার মিথ্যা মোহ থেকে সে বাঁচিয়েছিল। আমি যে সেটা ভাবছিলাম, এটা বোধ হয় ও ধরতে পারল। কেননা সে আমার কাছে এল এবং গভীর মনোযোগে সতর্কচিত্তে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। 'আপনার তো দেখি বয়সই হয়নি,' সে একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আমি তাকে তেল মারার চেষ্টা করলাম, 'তোমার বয়স বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আগের চেয়ে ভালো লাগছে।' 'আসলে কিন্তু,' সে বলল, 'এমনকি আপনার মৃত ঘোড়ার মতো মুখের ডাইস্-ও একটু ফিরেছে।' 'এর কারণ আমি আমার বেশ্যালয় বদলে ফেলেছিলাম,' তাকে খেপানোর জন্য বললাম। ও উৎসাহিত বোধ করল। 'আমার যদ্দুর মনে পড়ে, আপনার একটা লাঠি ছিল,' সে বলল, 'ওইটা কই?'

কী বলব বুঝে উঠলাম না। আমি পাশ কাটালাম। আমাদের শেষ দেখা হওয়ার পর আমার যেটা ঘটেছে সেটা হলো মাঝেমধ্যে আমার পাছায় খুব জ্বালা করে। সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা ধরে ফেলল, ব্যবহার না করতে করতে যা হয় আরকি। 'সবই ঈশ্বরের মর্জি,' তাকে বললাম, 'কিন্তু এটা ঠিক যে অনেক দিন ধরেই আমার পেছনটায় জ্বালা করছে, বিশেষ করে যেকোনো পূর্ণিমা রাতে।' রোসা তার এটা-ওটা রাখার বাক্সটা খুলে সবুজ রঙের পমেড ক্রিমের একটা কৌটা বের করল। ওটা থেকে আর্নিকা মলমের গন্ধ ছড়াল। 'ওই মেয়েটিকে বলবেন যে ও যেন ওর আঙুল দিয়ে এভাবে আপনাকে মলমটা লাগাইয়া দেয়,' এটা বলতে বলতে রোসা তার বুড়ো আঙুল বোলাল আমার শরীরে। ওকে প্রত্যুত্তরে বললাম, শোকর ঈশ্বরের কাছে যে ও আমার এমন দেখভাল করছে এখনো। সে হেসে উঠল, 'আরে মশাই, আপনার জীবনের দাম আছে না।' এর পরই কাজের কথায় ফিরে গেল।

'মাইয়াটা তো আপনার জন্য সেই ১০টা থেকে বইসা আছে,' সে বলল। 'মাইয়াটা সুন্দর, মার্জিত, সাফসুতরা। কিন্তু ডরে মারা যাইতাছে, কারণ হইল ওর এক বান্ধবী যে গাইরার এক অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে পালাইছে, তার নাকি অনেক রক্ত বার হইছিল...দুই ঘণ্টার মধ্যেই...।' কিন্তু রোসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার এটাও স্বীকার করল যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা গাইরার পুরুষগুলো এমনিই একটু খচ্চর প্রকৃতির। এর পরই আবার বিষয়ে ফিরে গিয়ে বলে, 'বেচারি! তা ছাড়া মাইয়াটাকে তো সারা দিন বোতাম বানানোর এক ফ্যাক্টরিতে কাজও করতে হয়।' 'তাই, এ আর এমন কী কঠিন কাজ।' 'হয়, হগল পুরুষেরা এ রকমই ভাবে,' প্রত্যুত্তরে রোসা বলে, 'কিন্তু এটা তো পাথর ভাঙার চেয়েও বাজে একটা কাজ।' একই সঙ্গে রোসা আমাকে জানায় যে মেয়েটিকে সে ব্রোমিনমাখা টোটকা খাইয়ে দিয়েছে এবং মেয়েটি এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। মেয়েটির প্রতি করুণা দেখাতে গিয়ে, আমি ভয় পেলাম, না জানি আবার রোসা এ অজুহাতে মেয়েটির দাম আরও বাড়ায় কি না। কিন্তু না, সে বলে, 'আমি এক কথার মানুষ। যা বলেছি তাই-ই, প্রতিটা সার্ভিসের জন্য আলাদা আলাদা দাম, ক্যাশ টাকায় দিবেন। তার সার্ভিস পাবেন। ব্যস!'

তাকে উঠোনের পথ ধরে অনুসরণ করলাম। তার কোঁচকানো ত্বক আর যখন দেখলাম সে তার সুতার কাপড়ের ব্যান্ডেজে বাঁধা পা-টা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন খারাপ লাগল। আকাশের ঠিক মাঝবরাবর প্রকাণ্ড চাঁদটা পূর্ণিমার আলো ছড়াচ্ছে আর বিশ্বচরাচর যেন সবুজ এক জলে ডুবে যাচ্ছে। ডেরার কাছেই তালপাতার একটা ছাউনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ফুর্তিফার্তির জন্য আর অনেকগুলো চামড়ার টুল পাতা, আর রশি দিয়ে টাঙানো কয়েকটি হ্যামক দোলনা। উঠোনের পর যেখানটায় অনেক ফলের গাছ, সেখানটায় ছিল ছয়টি পোড়া ইটের শোবার ঘর পাশাপাশি, আস্তরবিহীন, আর জানালাগুলো ছিল নেটের, যাতে মশা না ঢোকে। ঘরগুলোর কেবল একটিতেই মানুষ ছিল আর ওটাতে আলো নেভানো ছিল একটু, রেডিওতে তোনিয়া লা নেগ্রা প্যানপ্যানানি প্রেমের গান গাইছিল। রোসা কাবার্কাস শূন্যে হাত নাড়াতে নাড়াতে বলে, বোলেরো গানের চেয়ে ভালো আর কী আছে জীবনে। ওর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি যদিও একমত হলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ রকম কথা লেখার সাহস করিনি। সে দরজা ধাক্কা দিল, এক মুহূর্তের জন্য ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। 'এখনো ঘুমাচ্ছে,' বলল, 'ও বরং ঘুমাক, শরীরে একটু বিশ্রাম দরকার, আপনাকে ওর চেয়ে আরও বেশি রাত ধরে জেগে থাকতে হবে।' আমি ঠিক আগা-মাথা বুঝতে পারছিলাম না, 'আমার কী করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?' 'তা আপনিই ভেবে নেন, আপনি তো বহুত কিছু জানেন,' কেমন একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় সে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোনোমনো অবস্থায় আমাকে একা রেখে সে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

আর কিছু করার ছিল না। অস্থির মনে রুমে ঢুকলাম, দেখলাম মেয়েটি বিশাল খাটে অসহায় ভঙ্গিতে অঘোরে ঘুমাচ্ছে; ল্যাংটা, যেমনটা জন্ম দিয়েছিল তার মা। খাটের মাঝবরাবর শুয়ে আছে দরজার দিকে মুখ করে, সিলিংয়ের বাতির প্রগাঢ় আলোয় কোনো কিছুই আড়াল হওয়ার জো নেই। আমি খাটের কিনারে গিয়ে বসে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের জাদুটোনায় তার দিকে অনিমেষ চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। মেয়েটি শ্যামলা ও গরম। শরীরের বেশ যত্নআত্তি করেছে, সেটা বোঝা যায় তার সৌন্দর্যের ছটা দেখে—একেবারে সাফসুতরো। চুল কোঁকড়া করা, হাত ও পায়ের আঙুলের নখপলিশ, কিন্তু গুড়ের মতো রঙের ত্বকে জায়গায় জায়গায় দাগ আছে, খাটাখাটুনির ছাপ স্পষ্ট। স্তনগুলো এখনো বাচ্চা মেয়ের এবং কোনো এক নিগুঢ় শক্তির বলে উদ্ধতপ্রায়। তার শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো লম্বা, চুপচাপ পা ফেলা একজোড়া পা আর তাদের লক্ষণীয় লম্বা ও কোমল আঙুলগুলো। ফ্যান থাকার পরও ঘামে চিকচিক করছিল মেয়েটির শরীর, রাত বাড়তে থাকলে গরমের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। মুখটা আনাড়ি পটুয়ার আঁকা ছবির মতো কি না, সেটা বলা মুশকিল। গালে গাঢ় করে দুই ছোপ ফেস পাউডার আর রং মাখা, আলগা আইল্যাশ, ভ্রুজোড়া এবং দুই চোখের পাতা কাজল-কালিতে ধোয়া আর ঠোঁটগুলো চকলেট-বার্নিশে অতিরঞ্জিত। কিন্তু বেশভূষা কিংবা কাটা-চাটা-ঘষা-মাজা কোনোটাই তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে ঢাকতে পারেনি। লম্বা একটা নাক, জোড়া ভ্রু, মোটা ঠোঁট। লড়াকু কচি ষাঁড়ের কথা মনে হলো আমার।

রাত ১১টার সময় স্বভাবসুলভ বাথরুমের কাজগুলো সারার জন্য গেলাম আমি। বাথরুমে সুশোভিত এক চেয়ারের ওপর তার পরনের হতচ্ছিন্ন পোশাকগুলো কেমন একটা গরিবি বেশে পড়ে আছে। প্রজাপতির ছাপ মারা একটা হালকা ড্রেস, হলুদ ন্যাতানো অন্তর্বাস আর খড়ের এক জোড়া স্যান্ডেল আর সস্তা দোকান থেকে কেনা একখানা বালা আর ভার্জিনের মেডেল বসানো খুব পাতলা একটা চেইন কাপড়গুলোর ওপর রাখা। বাথরুমের বেসিনের শেলফে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ আর তার সঙ্গে লিপলাইনার, মেকআপ-বক্স, একটা চাবি আর কিছু খুচরা পয়সা। ব্যবহারে জীর্ণ অতি সস্তা সব জিনিসপত্র দেখে জগতে ওর চেয়ে গরিব আর কেউ আছে বলে আমার মনে হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ের কাপড়চোপড় খুলে খুব নির্দিষ্ট করে ওগুলোকে র‍্যাকে রাখলাম এমনভাবে যাতে সিল্কের শার্টের ভাঁজ নষ্ট না হয়। প্রস্রাব করলাম কমোডের ওপর বসে, যাতে পানি ছিটকে না পড়ে, যেমনটা ফ্লোরিনা দে দিওস আমাকে শিখিয়েছিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় চট করে বেসিনের আয়নায় একটু চেহারা দেখে নিলাম। আয়নার প্রান্ত থেকে যে ঘোড়াটি আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, তার মুখটি ঠিক মরা নয়। কিন্তু কেমন একটা হতাশার ভাব, পোপ মার্কা চোয়াল, চোখের পাতা কুঁচকানো ও চুলগুলি অগোছালো, যেগুলো একসময় সংগীতশিল্পীদের মতো লম্বা ছিল।

'ধুত্তরি,' লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি আমাকে ভালো না বাসলে আমি কী করব?'

তার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা না করে বরং নগ্ন হয়ে খাটে বসে রইলাম। এরই মধ্যে চোখ-সওয়া লাল আলোর ছলনায় চেয়ে চেয়ে মেয়েটিকে দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আমার বুড়ো আঙুলটাকে ওর ঘামে ভেজা ঘাড়ে একটু বোলাতেই ও ভেতর থেকে কেমন একটু আওয়াজ করে কেঁপে উঠল হার্পের ছন্দোময় বাজনার মতো। আমার দিকে পাশ ফেরাল একটু ঘোঁৎ শব্দ করে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝাঁজালো ঘ্রাণ আমাকে ঝাপটা মারল। আমি হাতের বুড়ো ও কড়ে আঙুল দিয়ে ওর নাকে চিমটি দিলাম আর মেয়েটি একটু কেঁপে উঠল। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে আমার দিকে তার কাঁধটি মেলে দিল ঘুম থেকে না জেগেই। কী এক অভাবিত আকর্ষণে আমার হাঁটু দিয়ে ওর পাগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করলাম। প্রথম দুই চেষ্টায় সে সাড়া দিল না, হাঁটু শক্ত করে রইল। যাতে শুনতে পায়, এমনভাবে ওর কানের কাছে গাইলাম, *লা কামা দে দেলগাদিনা দে আনহেলেস এস্তা রোদেয়াদা*। ও একটু আরাম বোধ করল। আমার শিরা-উপশিরা বেয়ে এক উষ্ণ উত্তেজনা বইতে লাগল আর আমার চাপা ধীরগতির পশুটি তার দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

আবেগের আতিশয্যে আমি মিনতির সুরে বললাম, দেলগাদিনা, আমার দেলগাদিনা। মেয়েটি করুণ কণ্ঠে কিছু একটা বলল, আমার কাছ থেকে হাঁটু সরিয়ে নিল, আমার দিকে কাঁধটি ফিরিয়ে শামুকের মতো নিজের ভেতর গুটিসুটি মেরে গেল। ওই কড়া টোটকা আমার মতো দেখি ওকেও কাবু করে ফেলেছিল। কেননা, কিছুই ঘটল না। না তার বা অন্য কারও। কিন্তু তাতে আমার তেমন কিছু গেল-এল না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম, মেয়েটিকে ঘুম থেকে জাগিয়েই বা কী লাভ। যদিও কেমন একটু অপমানিত বোধ করলাম, মন খারাপও হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত ১২টার ঘণ্টাধ্বনি ঢং ঢং করে উঠল; তীক্ষ্ণ, অনিবার্য। আর সেই সঙ্গে শুরু হলো শহীদ সান হুয়ান বাউতিস্তার স্মৃতিমাখা দিবস, ২৯ আগস্ট। কেউ একজন চেঁচিয়ে কান্না করছিল রাস্তায়। কিন্তু কে আর সেটা পাত্তা দেয়? যদি তার কাজে আসে, এই ভেবে লোকটির জন্য দোয়া করলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যও দোয়া করলাম, জীবনে যা যা পেয়েছি সেসবের জন্য শোকর প্রার্থনা করলাম : *জগতের কেউ বঞ্চিত না হোক, না, এই ভাবনায় যে সে যেটার অপেক্ষায় আছে, সেটার স্থায়িত্ব অনেক বেশি, সে এত দিন যা দেখেছে তার চেয়ে*। মেয়েটি ঘুমের মধ্যে একটু কুঁ করল এবং ওর জন্যও দোয়া করলাম : 'সবকিছুরই সময় আসবে।' এরপর রেডিও বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেশ ভোরে ঘুম যখন ভাঙল, তখন আমার আর খেয়াল নেই, কোথায় আছি। মেয়েটি তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে আমার দিকে কাঁধ দিয়ে, ভ্রূণদশায় একটা শিশু যেভাবে থাকে, ঠিক সেভাবে। কেমন অদ্ভুত লাগল! কেন যেন মনে হলো, অন্ধকারে কেউ জেগে উঠেছে, আর আমি বাথরুমের পাইপে পানির শব্দ পাচ্ছি। হতে পারে এ কোনো স্বপ্ন। একটা কিছু হলো আমার, যেটা এর আগে কখনোই হয়নি। এর আগে যত মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি সব সময়ই ওদের বাছাই করতে গিয়ে পয়সার ব্যাপারটাই মুখ্য হিসেবে কাজ করেছে, দরাদরি করে পোষালে ওদের নিয়েছি, আর না হলে, হয়নি। ওদের এই চেহারা-সুরতের ব্যাপারটা আমাকে কখনোই ভাবায়নি। রূপ দেখে কাউকে বাছাই করিনি কখনো। বেশির ভাগ সময়ই শুধু সম্ভোগের বশে সম্ভোগ করেছি, প্রেম-ভালোবাসার কোনো ব্যাপার সেটার মধ্যে ছিল না; পয়সা দিয়েছি, শুয়েছি, ব্যস। আর বেশির ভাগ দিন ঠিকমতো সব কাপড়ও খুলিনি, কোনোরকমে আধ-খানেক কাপড় খুলেই..., ব্যস। আর কাজটা করতাম অন্ধকারে, যাতে আমাদের কারোরই চেহারা দেখা না যায়। কিন্তু সে রাতে কী হলো, কে জানে? প্রথমবারের মতো একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল ঘুমন্ত একটা মেয়েকে ওইভাবে দেখতে। কোনো রকম কামনা-বাসনার তাড়া নেই, লজ্জার বালাই নেই কেবল মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ধ্যানস্থ হওয়া ছাড়া।

বিছানা ছেড়ে যখন উঠলাম, তখন ভোর পাঁচটা। একটু অস্থিরতা বোধ করছিলাম। কেননা, দুপুর ১২টার মধ্যে আমার রবিবাসরীয় লেখাটা সম্পাদকের টেবিলে হাজির করতে হবে। সময়মতো ঠিকই পায়খানার কাজ সারলাম; যদিও পূর্ণিমার কাল বলে পাছার জ্বালাটা ছিলই, আর যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্ল্যাশ টানলাম এবং পানি ছুটছিল, তখন মনে হলো বুঝি আমার অতীতের সব রোষ ওই ড্রেন দিয়ে ধুয়ে-মুছে চলে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়চোপড় পরে যখন আবার ঘরে ঢুকলাম, মেয়েটি তখন পেছন ফিরে ঘুমিয়ে আছে। ভোরের প্রথম আলো তার মুখে। বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ হলো, তার হাত দুটি খোলা, আড়াআড়িভাবে রাখা কুমারী এক নারী। ঈশ্বর তোমায় আগলে রাখুক—আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম। ওর আর আমার মিলিয়ে যা কিছু পয়সাকড়ি ছিল, সেগুলো বালিশে রাখলাম এবং সারা জীবনের জন্য ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম ওর কপালে চুমু খেয়ে। বাড়িটাকে ভোরের আলোয় আর দশটা বেশ্যালয়ের মতোই মনে হচ্ছিল, যেন স্বর্গের কাছাকাছি কিছু একটা। ফলবাগানের দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে এলাম, যাতে কারও সঙ্গে দেখা না হয়। কাঠফাটা রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার নব্বই বছরের ভার অনুভব করা শুরু করলাম আর মনে মনে মরে যাওয়ার আগের প্রতিটি মিনিট প্রতিটি প্রহর গুনতে শুরু করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

পাঠাগার বলতে যা বাকি আছে, সেখানটায় বসে আমি এই স্মৃতিকথাগুলো লিখছি, যেটা একসময় আমার মা-বাবার ছিল। আর যার শেলফগুলোর অবস্থা যেনতেন, বইয়ের পোকাদের ধৈর্যগুণে। সবকিছু বলা-কওয়ার পর আমার যদি এই পৃথিবীতে কিছু করার থাকে, তাহলে আমি আমার বিভিন্ন ধরনের অভিধান, দোন বেনিতো পেরেস্ গালদোসের *এপিসোদিওস নাসিওনালেস*-এর প্রথম দুই সিরিজ আর আমাকে আমার যক্ষ্মাক্রান্ত মায়ের মেজাজ ধরতে শিখিয়েছিল যে বইটি, সেই *দ্য ম্যাজিক মাউন্টেইন* নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মনে হয়, সব আসবাব এবং আমাকে মিলিয়ে কেবল এই বড় টেবিলটা, যেটাতে আমি লিখছি, এটাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও মজবুত হয়েছে। কারণ আমার দাদা, যিনি ছিলেন জাহাজের কাঠমিস্ত্রি, বেশ ভালো জাতের কাঠ দিয়ে এটাকে বানিয়েছিলেন। এমনকি যখন আমাকে লিখতে হয় না, তখনো যথাসাধ্য টেবিলটাকে গুছিয়ে রাখি প্রতিদিন সকালে। আর এর পেছনে খাটতে খাটতে আমার বেলাই চলে গেল, হারালাম সব প্রেমিকাকে। হাতের নাগালেই আমার সংগ্রহের পবিত্র গ্রন্থগুলো: ১৯০৩ সালে প্রকাশিত রেয়াল আকাদেমিয়ার প্রথম *ইলাস্ট্রেটেড অভিধান*-এর দুই খণ্ড, দোন সেবাস্তিয়ান দে কোভাররুবিয়াসের কাস্তেইয়ানো বা স্প্যানিশ ভাষার যথাশব্দ সংগ্রহ; দোন আন্দ্রেস বেইয়োর ব্যাকরণগ্রন্থ, শব্দার্থগত কোনো প্রশ্নের উত্তরে যা অপরিহার্য; দোন হুলিও কাসারেসের উদ্ভাবনী *ভাবাদর্শগত অভিধান,* বিশেষ করে এর সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দভান্ডারের জন্য; নিকোলা জিঙ্গারেল্লির ইতালিয়ান *ভাষার শব্দসম্ভার,* যাতে আমার মায়ের ভাষাটি আমার রপ্ত থাকে, সেই শিশু অবস্থায় যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখেছিলাম। আরেকটা লাতিন অভিধান, যেহেতু কাস্তেইয়ানো বা স্প্যানিশ আর ইতালিয়ান দুটি ভাষারই আদিতে লাতিন; এটাই মূল ভাষা।

লেখার টেবিলটার বাঁ পাশে আমি সব সময়ই আমার রবিবাসরীয় কলামগুলোর জন্য সাধারণ কাগজের অফিস সাইজ পাঁচটি শিট রেখে দিই, আর থাকে কালি শুকানোর জন্য বালু দেওয়া পাত্র, আধুনিক কালের ব্লটিং পেপারের চেয়ে ওটাই আমার পছন্দ। আর ডান পাশে কালির দোয়াত ও হালকা বালসা কাঠের কলমদানি, যেটাতে একটা সোনালি কলম রাখা। কেননা, এখনো আমি রোমান্টিক হিসেবেই লিখি, যে রকম ফ্লোরিনা দে দিওস আমাকে শিখিয়েছিলেন, যাতে তাঁর স্বামীর, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিনি নোটারি পাবলিক ও ডিগ্রিধারী হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যাঁর কেরানি মার্কা হাতের লেখা আবার আমি না যেন পেয়ে বসি। অল্প কয়েক দিন আগে পত্রিকা অফিস থেকে সবাইকে টাইপ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে লিনোটাইপ লিডে লেখার স্বচ্ছতা বাড়ে এবং টাইপ সেটিংয়ে আরও বেশি করে যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি এই বাজে অভ্যাসটা হতে দিইনি আমার মধ্যে। তাতে লেখার অভ্যাসটা আমি বজায় রাখলাম। হাঁস যে রকম অবিরাম ঠোকরাতেই থাকে, সে রকম টাইপরাইটারে আবার লেখাটা কপি করতে থাকলাম। ভাগ্য ভালো, হাউসের সবচেয়ে বয়স্ক কর্মচারী বলে কেউ আর ব্যাপারটা ঘাঁটল না। আজকে যদিও আমি অবসরে চলে গেছি কিন্তু হেরে তো আর যাইনি, তাই এখনো বসে গোপনে লেখালেখিটা চালিয়েই নিচ্ছি। আর লেখার সময় ফোনের তারটা খুলে রাখি, যাতে করে কেউ বিরক্ত না করে। আর খবরদারি করারও কেউ নেই যে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে আমি কী লিখছি না-লিখছি।

আমার বাড়িতে কুকুর, পোষা পাখি বা চাকরবাকর বলতে কিছুই নেই। একমাত্র বিশ্বস্ত দামিয়ানা ছাড়া যে আমাকে জগতের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছিল, যে এখনো প্রতি সপ্তাহে একবার এসে দেখে যায় কী লাগবে না লাগবে, এমনকি তার এই অবস্থায়ও। চোখটা প্রায় যায় যায়, তার ওপর কমে আসছে বোধশক্তি। মৃত্যুশয্যায় আমার মা আমাকে বয়স কম থাকতে থাকতে ফরসা দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে বলেছিলেন, তিন-তিনটা সন্তান যেন নিই সেটাও বলেছিলেন। আবার তাদের মধ্যে একজনের নাম যেন তাঁর নামে রাখি, যেটা আবার তাঁর মায়ের নাম ছিল এবং নানির নামও ছিল। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুরোধটা রাখার খুবই ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু এই তারুণ্যের ভাবটা আমার মধ্যে এমনভাবে ছিল যে আমার কোনো দিনই মনে হয়নি যে আমি দেরি করছি। শেষ পর্যন্ত এল সেই ভীষণ গরম দুপুরবেলা, যখন আমি প্রাদোমার-এ পালোমার দে কাস্ত্রো পরিবারের যে বাড়িটা আছে, সেখানে ভুলে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম নগ্না শিমেনা ওরতিস্‌কে, বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে, ওই দরজার সঙ্গে লাগানো রুমটায় সিয়েস্তা নিচ্ছে। দরজার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে ছিল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে চোখের পলক না ফেলতেই এমন ভঙ্গিতে সে আমার দিকে চাইল যে আমি পালানোর সময় পেলাম না। ওহ্!...দুঃখিত, কোনোরকমে আমি বললাম, আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সে হাসল, গজলা হরিণের মতো লাবণ্যতায় আমার দিকে ঘুরে তার সমস্ত শরীর আমার চোখের সামনে মেলে ধরল। গোটা রুমটা কেমন একটা নিবিড় ঘোরে ডুবে গেল যেন। তার নগ্নতা নিখুঁত নয়, যেমনটা এদুয়ার্দ মান-এর চিত্রকর্ম *অলিম্পিয়া*, তার কানের পেছনে কমলারঙা পাপড়ির এক বিষাক্ত ফুল গোঁজা, ডান হাতের কবজিতে একটা সোনার বালা আর গলায় ছোট ছোট মুক্তা বসানো একটা হার। আমি ভাবলাম, আমার জীবদ্দশায় এতটা উত্তেজক আর কিছু বোধ হয় দেখব না। আজ হলফ করে বলতে পারি, আমার চিন্তাটা ঠিকই ছিল।

আমি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। নিতান্ত নির্বোধের মতো একটা কাজ যে করে ফেললাম, সেই অস্বস্তিবোধে ভাবলাম, যে-করেই হোক, তাকে ভুলে যেতে হবে। কিন্তু বাদ সাধল শিমেনা ওরতিস্। সে আমাকে পরিচিত বন্ধুদের মারফত খবর পাঠাল, চিরকুটে প্ররোচনাপূর্ণ কথাবার্তা, নাশকতামূলক হুমকি, আবার এদিকে রটিয়ে বেড়াল যে আমরা নাকি একজন আরেকজনের জন্য পাগল; অথচ আদতে আমাদের মধ্যে একটাও বাক্যবিনিময় হয়নি। তাকে কোনোভাবেই আটকানো গেল না। তার চোখগুলো ছিল যেন বন্য বিড়াল। সুসজ্জিত পোশাকে যেমন আবার শরীরে কাপড় না থাকা অবস্থায়ও—দুভাবেই সমান আকর্ষণীয়া, উত্তেজক, তার অট্টহাসি, সোনালি একরাশ ঘন চুল যার রমণীয়া গন্ধে মাতাল আমি রাগে-দুঃখে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলাম। আমি জানতাম যে ব্যাপারটা কোনো দিনই প্রেমে গড়াবে না। কিন্তু আমার প্রতি তার ওই শয়তানি আকর্ষণটা এতটাই আগুনমাখা যে আমি পথে পড়লেই হলো, অমনি যেকোনো সবুজ চোখের বেশ্যার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ওই অবস্থা থেকে বাঁচার চেষ্টা চালালাম। প্রাদোমারের ওই বাড়িতে ওই রুমে ওই বিছানায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে শুয়ে আছে—এই স্মৃতির আগুনটা কোনোভাবেই নেভাতে পারলাম না। অগত্যা আত্মসমর্পণ করতেই হলো। তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব গেল, আংটিবদল হলো আর ইস্টারের পরে সপ্তম রবিবারের আগেই এক রবিবারে ধুমধাম করে বিয়ের ঘোষণা হলো।

বিয়ের খবরটা নিয়ে শহরের সোসাইটি ক্লাবগুলোর চেয়েও বরং চীনা মহল্লায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। প্রথম প্রথম খবরটা নিয়ে সবাই একটু ঠাট্টাই করল, কিন্তু অচিরেই ব্যাপারটা রীতিমতো একটা হয়রানিতে গিয়ে ঠেকল, যখন জ্ঞানী-গুণী মহিলারা কথা বলতে শুরু করলেন, যাঁদের কাছে বিয়েটা একট পবিত্র শর্তের চেয়েও বরং হাস্যকর একটা ব্যাপার। খ্রিষ্টীয় নিয়মরীতিতে সব সাজানো হলো আমার এনগেজমেন্ট উপলক্ষে আমার হবু স্ত্রীর বাড়ির ছাদে, আমাজনের অর্কিড আর ঝুলে থাকা গুল্মলতার বাহারি শোভায়। সাদা লিনেনের কাপড়চোপড় পরে ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় আমার হাজির হওয়ার কথা হাতে তৈরি পুঁতির মালা কিংবা সুইস চকলেটের উপহার নিয়ে, তারপর আমার কথা বলব। আধেক সময় ভাঙা ভাঙা কথা আর আধেক সময় ভারিক্কি কথাবার্তা হবে। এভাবে ১০টা বাজবে, অভিভাবিকা হিসেবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আর্গেনিদা আন্টি, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই যিনি ঘুমিয়ে পড়বেন কথা বলতে বলতে, সেকালের উপন্যাসগুলোর ওই ধরনের অভিভাবক চরিত্রদের মতো। দিন দিন শিমেনাকে যতটা ভালো করে জানতে লাগলাম, সে ততই এত এত খেতে লাগল রাক্ষসের মতো। জুনের ভ্যাপসা গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গায়ের জামা, পেটিকোট সব ফেলে দিতে লাগল আর রাতের আঁধারে যে তার ক্ষমতাটা বিধ্বংসী হবে, সেটা তো আগে থেকেই ভাবা গিয়েছিল। দুই মাস এনগেজড থাকার পর আমাদের মধ্যে কথা বলার আর কিছুই থাকল না। আর কথা নাই বার্তা নাই, অমনি সে সন্তানাদির প্রসঙ্গ তুলে বাচ্চাদের ছোট উলের বুটজুতা বোনা শুরু করল। সবকিছুতে রাজি এই আমি—তার হবু জামাই তার সঙ্গে উল বোনা শিখলাম এবং এভাবেই আমাদের অলস সময় কেটে গেল বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত। আমি বুনলাম ছেলেদের জন্য নীল রঙের ছোট ছোট বুট আর সে বুনল মেয়েদের জন্য গোলাপি রঙের বুট, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কার কথা ঠিক হয়। শেষ পর্যন্ত ৫০টিরও বেশি বাচ্চার বুট বোনা হলো। রাতের ১০টা বাজার আগেই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে চীনা মহল্লায় চলে যেতাম আমি রাতটা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় কাটানোর জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীনা মহল্লায় আমার কুমারজীবনের যে উথালপাথাল অবসান ঘটেছিল, তার একেবারে বিপরীতে ছিল ওই সোশ্যাল ক্লাবের সন্ধ্যাগুলো। আর এই তফাতটাই আমার কাছে স্পষ্ট করে তুলেছিল এ দুই জগতের কোনটা আসলে আমার, সে বিষয়টি। এবং আমি ধরে নিয়েছিলাম যে দুটিই আমার, যার যার সময় অনুযায়ী। কেননা, একটা থেকে আমি দেখতে পেতাম অন্যটাকে। সমুদ্রে পাশাপাশি দুই জাহাজের একটি যখন অন্যটির কাছ থেকে বিদায়ের ভোঁ তুলে দুঃখভারাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যায় ওই বন্দর ছেড়ে, সে রকম। বিয়ের ঠিক আগের রাতে, *এল পোদের দে দিওসে* নাচের শেষে একটা পর্ব হলো, যেটা কেবল যৌন আসক্ত গালিসিয়ার কোনো যাজকের বেলায়ই ঘটতে পারে, যে তার সব মহিলা কর্মীকে মুখঢাকা কাপড় পরিয়ে ছাড়লেন আর তার সঙ্গে থোকা থোকা ফুল। অবস্থা এমন যে তাদের সবাই আমাকে আধ্যাত্মিক দিব্যি দিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন যেন। আধ্যাত্মিক শুদ্ধির আর রীতির চরম বরখেলাপ করা হয়েছিল সে রাতে। একই সঙ্গে ২২ জন মহিলা ভালোবাসা আর আনুগত্যের শপথ নেন আর এদিকে আমি জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকব—সহযোগিতার হাত বাড়ানোর সেই প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আর কোনোভাবেই ঠিক হবে না, এমন একটা কিছু ঘটার আগাম আশঙ্কায় ঘুম হলো না। মাঝরাতে গির্জার ঘড়ির ঘণ্টার সঙ্গে প্রহর গুনলাম, যতক্ষণ না ঢং ঢং করে সাতবার আওয়াজ আমাকে জানিয়ে দিল যে গির্জায় যাওয়ার সময় হয়েছে। সকাল আটটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অনেকক্ষণ ধরে বেজেই চলেছে, এক ঘণ্টার ওপর কী রকম একটা অনিশ্চিত আওয়াজ। শুধু যে টেলিফোনটা ধরলাম না তা নয়, উপরন্তু আমার শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। ১০টার কিছুক্ষণ আগে কেউ একজন দরজায় আওয়াজ করল, প্রথমে হাতের বারি, তারপর আমার চেনাজানা কিছু বাজে লোকের চিৎকার। আমি ভয় পেলাম এই ভেবে যে, না জানি ওরা আবার দরজা ভেঙে কী এক বিপত্তি ঘটিয়ে বসে। কিন্তু ১১টার মধ্যে বাড়িতে একেবারে সুনসান নীরবতা নেমে এল চরম সর্বনাশের ভেতর দিয়ে। তারপর আমি কাঁদলাম ওর জন্য, আমার জন্য এবং আকুলভাবে প্রার্থনা করলাম, ওর সঙ্গে এই জীবনে আমার যেন আর দেখা না হয়। কোনো সন্ত আমার প্রার্থনা একটু শুনে থাকবেন হয়তো। কেননা, সে রাতেই শিমেনা ওরতিস্ দেশ ছেড়ে যে চলে গেল, এর বিশ বছর পর ফিরল বিবাহিতা সাত সন্তানের জননী হয়ে, যে সন্তানগুলো আমার হতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই সামাজিক অপমানের পর আমার পক্ষে নিজের অবস্থান ধরে রেখে *এল দিয়ারিও দে লা পাস্* পত্রিকায় কলাম লিখে যাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। যা-ই হোক, শুধু এ কারণেই যে তারা আমার কলামটা ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল তা নয়, বরং বিংশ শতাব্দী যেভাবে পত্রিকার খবর হয়ে জেঁকে বসল, সে কারণটাও কাজ করেছে। প্রগতি হয়ে উঠল শহরের মিথ। সবকিছু বদলে গেল, উড়োজাহাজ উড়ল, এক ব্যবসায়ী এক বস্তা চিঠি শূন্যে ফেলে দিল উড়োজাহাজ থেকে আর এয়ার মেইলের চল শুরু হলো।

শুধু যে জিনিসটা আগের মতোই রয়ে গেল, সেটা হলো আমার পত্রিকার জন্য লেখা কলামগুলো। তরুণ সম্প্রদায় ওগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ ছুড়তে শুরু করল, যেন তারা প্রাগৈতিহাসিক কালের এক মমির বিরুদ্ধে নেমেছে। কেননা, তাদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু আমি একই সুরে লিখতে লাগলাম এবং যুগের হাওয়ার ধাক্কায় কোনো কিছু বদলালাম না। এক কান দিয়ে শুনছিলাম আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছিলাম সব। আমার বয়স তখন চল্লিশে পড়েছে, কিন্তু তরুণ স্টাফ রাইটাররা এটার নাম দিল 'মুদাররা দ্য বাস্টার্ড'-এর কলাম। সেই সময়কার সম্পাদক আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে নিয়ে হালের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বললেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, যেন এইমাত্র ভেবেছেন: পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। জি, ঠিকই বলেছেন, পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আমার রবিবাসরীয় কলামটা তিনি বাদ দেননি, কারণ ওই রকম তারবার্তা সম্পাদক তিনি আর খুঁজে পাবেন না। আজ আমি জানি যে আমি ঠিক কাজটি করেছি এবং এর ব্যাখ্যাটাও আমার জানা। আমার প্রজন্মের উঠতি বয়সীরা লোভের বশবর্তী হয়ে জীবনে, মনেপ্রাণে ভুলেই বসেছিল তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। যতক্ষণ না বাস্তবতা তাদের শেখাল যে তারা আগামী ভবিষ্যৎ বলতে যা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল তার সবই ভুল, নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসল তাদের। আমার রবিবাসরীয় কলামগুলো থাকল, অতীতের পুরাকীর্তির এক প্রশ্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ যেন ওগুলো। আর ওরা বুঝল যে ওই লেখাগুলো শুধু বুড়োদের জন্যই নয় বরং জোয়ানদের জন্যও, যারা বুড়িয়ে যাওয়াকে মোটেই ভয় করে না। কলামটা আবার সম্পাদকীয় পাতায় ফিরে গেল এবং বিশেষ দিনে, এমনকি প্রথম পৃষ্ঠায়ও ছাপা হলো।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আমি বরাবরই সত্যটাই বলি, বেশ্যাদের কারণে আমার আর বিয়ে করা হয়নি। তার পরও আমি বলব যে আমার নব্বইতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মদিনের আগে এ ব্যাখ্যাটা আমার কাছে ছিল না, যেদিন আমি রোসা কাবার্কাসের বেশ্যালয় থেকে বের হয়ে এই সংকল্পবদ্ধ হলাম যে জীবনে আর কখনো নিয়তিকে চটাব না, নিজেকে অন্য এক মানুষ মনে হলো সেদিন। পার্কের কাছে শিকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দেখলাম নোংরা জনতা, আর অমনি মেজাজটা বিগড়ে গেল। দামিয়ানা মেঝে ধুচ্ছিল, একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে শোবার ঘরে, এই বয়সে তার উরুর তারুণ্যের উচ্ছলতা দেখে আমার মধ্যে ফেলে আসা একসময়ের শিহরণ খেলা করল। সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা টের পেল, কেননা স্কার্ট দিয়ে ঢেকে ফেলল। আমি আর লোভ সংবরণ না করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলো তো দামিয়ানা, তোমার কী মনে পড়ে?' 'আমার তো কিছু মনে পড়ছিল না', সে বলল, 'কিন্তু আপনার কথায় মনে পড়ে গেল।' আমার বুকে একটু ভার অনুভব করলাম। 'আমি কোনো দিনই প্রেমে পড়িনি', তাকে বললাম। কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই সে উত্তর দিল, 'আমি পড়েছি।' সে শেষ করল কথা, কাজ না থামিয়ে, 'বাইশ-বাইশটা বছর আমি আপনার জন্য কেঁদেছি।' এ কথা শুনে আমার বুক একটু নড়েচড়ে উঠল। সম্ভ্রমের সঙ্গে একটু এড়ানোর ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'আমরা দুজন মিলতাম ভালোই।' 'কিন্তু আজ আপনি এ কথা বলছেন', সে বলে, 'আজ কোনো রকম সান্ত্বনা হিসেবেও আপনার স্থান নেই আমার কাছে।' বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় খুব স্বাভাবিকভাবে সে বলে, 'আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি আজও কুমারী।'

কিছুক্ষণ পর দেখলাম পুরো বাড়ির সব কয়টা ফুলদানিতে লাল গোলাপের তোড়া, দামিয়ানার কাজ এটা। আমার বালিশের কাছে পেলাম একটা কার্ড : *আশা করি আপনার কপালে কিছু একটা জুটবে*। খাট্টা মনে আগের দিন অর্ধেক লেখা কলামটা নিয়ে বসলাম শেষ করার জন্য। দুই ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে একটানে লিখে ফেললাম কলামটা আর হৃদয় নিংড়ে আমার সমস্ত হিম্মত নিয়ে লেখাটি সাজালাম পাছে না আবার কেউ আমার কান্না দেখে ফেলে। বিলম্বিত অনুপ্রেরণার মুহূর্তে আমি কলামটা শেষ করতে চাইলাম এই বলে যে, এর সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ ও উল্লেখযোগ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল মরে যাওয়ার দুঃখজনক আবশ্যকীয়তা ছাড়াই।

আমার ইচ্ছা ছিল লেখাটা অফিসের রিসেপশন কাউন্টারে রেখে বাড়ি ফেরার, কিন্তু পারলাম না। গোটা অফিসের সব স্টাফ আমার অপেক্ষায় ছিল আমাকে নিয়ে আমার জন্মদিন পালন করবে বলে। অফিস ভবনটা নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল, জায়গায় জায়গায় কাজ চালানোর নানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র আর ভাঙাচোরা ইট-পাথর, কিন্তু ওরা কাজ থামিয়ে রেখেছিল জন্মদিনের পার্টির কারণে। কাঠমিস্ত্রি যে টেবিলটার কাজ করছিল, তাতে নানা রকম ড্রিংকস আর র‍্যাপিং পেপারে মোড়া জন্মদিনের নানা উপহার ছিল। ক্যামেরার ফ্লাশের আলোর ঝলকানিতে মুহুর্মুহু তোলা প্রতিটি ছবিতেই আমি ছিলাম।

রেডিওর সংবাদ পাঠক ও শহরের অন্যান্য পত্রিকার রিপোর্টারদের দেখে ভালো লাগল: সকালবেলাকার রক্ষণশীল পত্রিকা *লা প্রেন্‌সা,* উদারপন্থী *এল এরাল্‌দো* এবং সন্ধ্যাবেলায় বের হওয়া বারুদঠাসা খবরের ট্যাবলয়েড *এল নাসিওনাল,* যেটা পাঠকসমাজের দুশ্চিন্তা-দুর্বিষহ লাঘব করার জন্য প্রতিনিয়ত চটকদার প্রেমকাহিনি ছাপে। তাদের সবাইকে একসঙ্গে দেখে অবাক লাগে না, শহরের মঙ্গলের জন্য পত্রিকা অফিসগুলোর সবার এই বন্ধুতার দরকার আছে বৈকি, যদিও ওদিকে প্রধান সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছেন।

আরও উপস্থিত ছিল, যদিও তার রুটিনের মধ্যে পড়ে না, অফিশিয়াল সেন্সরকর্তা দোন হেরোনিমো ওর্তেগা, যাকে আমরা *ঘৃণ্য জঘন্য অমানুষ* নামেই ডাকি। কেননা, প্রতিদিন ঠিক সাত ৯টায় তার প্রতিক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক রঙের লাল পেনসিল নিয়ে হাজির হয়ে পরের দিনের পত্রিকায় যাচ্ছে এ রকম প্রতিটি চিঠি কাটছাঁটা করে তার খবরদারি জারি করতে ভুলতেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তিনি ঘোর অপছন্দ করতেন, হয়তো আমার ব্যাকরণবিদ মার্কা লেখার জন্য, নয়তো এ কারণে যে কোনো রকম কোটেশন চিহ্ন বা বাঁকা হরফ ছাড়াই ইতালিয়ান শব্দ ব্যবহার করি এবং এ কারণে লেখাগুলো আর দশটা স্প্যানিশ লেখার চেয়ে বেশি ভাবব্যঞ্জক মনে হয়, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত দুটি ভাষার মধ্যে যা একটি স্বাভাবিক প্রয়োগবিধি। চার-চারটি বছর তাকে সহ্য করার পর শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই মেনে নিলাম।

সেক্রেটারিরা একটি কেক নিয়ে এলেন। ৯০টা মোমবাতি জ্বলছে, যেটা আমাকে প্রথমবারের মতো মনে করিয়ে দিল আমার বয়স। নিজের কান্না সামলাতে হলো, যখন সবাই মিলে জন্মদিনের গান গাইল এবং কেন জানি ওই মুহূর্তে মেয়েটির কথা ভাবলাম। ঠিক কোনো তিক্ততা নয়, বরং একজনের জন্য প্রলম্বিত করুণা, যার কথা আবার মনে পড়বে বলে ভাবিনি। মুহূর্তটা পার হতেই কেউ একজন আমার হাতে একটা ছুরি ধরিয়ে দিলেন কেকটা কাটার জন্য। আবার কেউ হেসে ওঠে, এই ভয়ে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো বক্তৃতা-টক্তৃতায় গেল না। কারও প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। পার্টির সমাপ্তি টানতে গিয়ে প্রধান সম্পাদক, যাকে আমি কোনো দিন খুব একটা পছন্দ করতাম না, চরম বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের সবাইকে, তো নব্বই-এ পড়ল যাঁর বয়স, তিনিই গুণীজন। তিনি আমাকে বললেন, 'কলামের লেখাটা কই?'

সত্যি বলতে কি, গোটা বিকেল জ্বলন্ত কয়লার মতো আমার পকেটের ভেতর যে ওটা পুড়ছিল, সেটা কিন্তু টের পাচ্ছিলাম, কিন্তু আবেগ আমার ভেতর এমনভাবে কাজ করছিল যে ইস্তফাপত্রটা দিয়ে পার্টিটার মজা নষ্ট করে দেওয়ার সাহস ছিল না। উত্তরে বললাম, 'এবারের লেখাটা তো লিখিনি।' যেন লেখাটা গত শতাব্দীতে দেওয়ার কথা ছিল। 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন', আমি বললাম, 'রাতটা আমার খুব খারাপ গেছে, এতটাই খারাপ যে অসাড় একটা বোধে ঘুম ভেঙে যায়।' 'যা-ই হোক, আপনার সেটা লেখা উচিত ছিল', তাঁর তিরিক্ষি রসিকতার সুরে বলেন। নব্বই বছর বয়সে জীবনটা কেমন, এটা নিশ্চয়ই পাঠকেরা জানতে চাইত। পত্রিকা অফিসের সেক্রেটারিদের একজন এসে কী কথা বলল। রসাল কোনো গোপনীয় খবর হবে হয়তো, মেয়েটি কথাটা বলে আমার দিকে একটু দুষ্টুমির চোখে তাকাল—কী, তাই না? আমার চোখেমুখে আগুনের হালকা শিখা। ধুত্তুরি, মনে হলো লজ্জায় লাল হওয়াটা তো অনুচিত। আরও একজন হাস্যোজ্জ্বল মহিলা সেক্রেটারি আমার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। চমৎকার! আপনার গাল এখনো এভাবে লজ্জায় লাল হয়। তার ধৃষ্টতায় আগের চেয়ে আরও বেশি রক্তলাল হয়ে উঠল মুখ। মনে রাখার মতো একটি রাত, মহিলা সেক্রেটারিদের প্রথমজন বলে, 'আমার হিংসা হচ্ছে।' এই বলে সে আমার গালে একটা চুমু খেল এবং লিপস্টিকের দাগ বসে গেল। ফটোগ্রাফারদের দয়ামায়া বলে কিছুই ছিল না। কী করব বুঝতে না পেরে আমি প্রধান সম্পাদকের কাছে কলামের লেখাটা দিলাম এবং বললাম যে এর আগে যা বলেছি সেটা ঠাট্টা। এই নিন, এই বলে আমি পালালাম, করতালি আর হইহুল্লোড়ের ভেতর থেকে কোনোরকমে, যাতে আমার না থাকতে হয়। কেননা, ওটা খুললেই তো দেখবে যে ওটা লেখা নয় বরং আমার ইস্তফাপত্র, পঞ্চাশ বছরের টানা প্রুফের পর।

বাড়িতে বসে জন্মদিনের উপহারগুলোর র‍্যাপিং খোলার সময়ও আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলাম। লাইনোটাইপিস্টরা ভুল করে আবারও একটি ইলেকট্রিক কফিপট দিয়েছে, যে রকম তিন-তিনটি কফিপট আমায় ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে আগের জন্মদিনগুলোয়। টাইপোগ্রাফাররা দিয়েছে একটা কাগজ, যেটা দেখালেই পৌর করপোরেশনের পশু আশ্রম থেকে একটা অ্যাঙ্গোরা বিড়াল পাওয়া যাবে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষে আমার জন্য একটা ছোটখাটো বোনাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেক্রেটারিরা উপহার হিসেবে দিয়েছে চুমুর চিহ্ন আঁকা তিন জোড়া সিল্কের আন্ডারওয়্যার আর সঙ্গে একটা কার্ড, যাতে লেখা, আমার জন্য ওই চুমুর দাগগুলো ওরা সরাতে কার্পণ্য করবে না। আমার মনে হলো যে বুড়ো বয়সের একটা মজা বোধ হয় এই যে অল্প বয়স্ক তরুণী বন্ধুরা সহজেই কাছে ঘেঁষে। কেননা, তাদের ধারণা, আমরা ফুরিয়ে গেছি।

আমার কাছে কে যে স্তেফান আস্কেনাসের বাজানো শপাঁর টোয়েন্টি ফোর প্রিলিউডের একটা রেকর্ড পাঠাল, সেটা কোনো দিনই জানতে পারিনি! স্টাফ রাইটারদের অধিকাংশই দিয়েছেন বেস্ট সেলিং সব বই। সব উপহারের বাক্স তখনো খোলা হয়নি, ঠিক এ রকম সময় রোসা কাবার্কাস ফোন করে এমন এক প্রশ্ন করল, যেটার জন্য আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না : 'ওই মাইয়াটার সঙ্গে আপনার কী হইছে?' 'কিছুই না, চিন্তা না করেই বললাম।' 'ক্যামনে কন কিছুই না? যখন আপনি মাইয়াটারে এমনকি ঘুম থেকেও তোলেন নাই?' রোসা কাবার্কাস বলে, 'কোনো মাইয়া সেই লোকরে কোনো দিনই মাফ করে না, যে তারে প্রথম মোলাকাতে হেলাফেলা করে। শুধু বোতামের কাজ কইরা তো আর একটা মাইয়া এত নেতাইয়া পড়ে না, এইডাই আমি ভাইব্যা খুশি হইছি। আর মনে হয়, আবার কী হইয়া যায় এই ডরে ঘুমের ভান কইর‍্যা পইড়া রইছে। আর আসল কথা হইল', রোসা বলে, 'মাইয়াটা আসলেই বিশ্বাস করে যে আপনার দ্বারা আর হইব না, আর আমি চাই না যে ও হগলরে এই কথা কইয়া বেড়াক।'

আমি অবাক হওয়ার মতো কোনো সন্তোষ প্রকাশ করলাম না। আর যদি সেটা ঘটেও থাকে, তাকে বললাম, 'মেয়েটির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে ও কি জাগ্রত না ঘুমন্ত, সেটার প্রশ্ন অবান্তর : ওকে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।' রোসা কাবার্কাস গলার স্বর নিচু করে : 'সমস্যাটা হইল যে কথাবার্তা কত জলদি করা যাইব, তয় সেটার সমস্যা নাই, দেখবেন সব ঠিক হইয়্যা যাইব।' মেয়েটির মুখ থেকে আসল কথা বের করে ছাড়বে এই প্রতিজ্ঞা করে সে, আর উচিত হলে সে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করাবে তাকে, 'আপনি কী মনে করেন?' 'বাদ দাও, আমি বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রকম কিছুই ঘটেনি।' বরং ভালোই হলো যে আমি বুঝলাম, এ রকম ছোটাছুটির কোনো মানে হয় না আমার এই বয়সে। সেই হিসাব মোতাবেক মেয়েটি ঠিকই বলেছে—আমি আর পারব না। ফোনটা রেখে দিলাম, জীবনে এতটা স্বাধীন আর কখনই মনে হয়নি নিজেকে। শেষ পর্যন্ত একটা বশ্যতার কাছ থেকে মুক্ত হলাম, যেটার দাস হয়ে আছি সেই তেরো বছর বয়স থেকে।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে চারুকলার হলে গেলাম জ্যাক থিবো আর আলফ্রেড কোরতোর আমন্ত্রণে, ভায়োলিন সোনাটার বাদনের জন্য যারা সুবিদিত, যেমনটা পিয়ানোর জন্য সেসার ফ্রাঙ্ক। কনসার্টের বিরতিলগ্নে শুনলাম মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ। গুরু সংগীতজ্ঞ পেদ্রো বিয়াবা আমাকে প্রায় ঠেলে ড্রেসিং রুমে নিয়ে গেলেন বাদকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি ওদের পরিবেশনায় এতটাই বিমোহিত যে এদের শ্যামানের একটি সোনাটা বাজানোর জন্য অভিনন্দিত করলাম। আদতে ওই সোনাটা ওরা বাজায়ইনি এবং কেউ একজন জনসমক্ষেই আমার ভুলটা ধরিয়ে দিল অপ্রীতিকরভাবে। ওদের বাদনে মনোমুগ্ধ অবস্থায় খেয়ালই করিনি সোনাটা কোনটা শুনলাম। আর এই সামান্য ভুলটাই স্থানীয় সংগীতমহলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হলো এবং ব্যাপারটা আরও বাজে আকার ধারণ করল, যখন পরের রোববার আমার কলামে কনসার্টটির ওপর দু-চার কথা বলতে গিয়ে আমার ওই ভুলটার কোনোরকম একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে প্রথমবারের মতো কাউকে মেরে ফেলতে পারব বলে মনে হলো। বাড়িতে ফিরলাম ছোট শয়তানটার জ্বালায়, যে আমাদের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে সেসব মারাত্মক উত্তর শোনায়, যেগুলো সঠিক সময়ে আমরা দিই না। বই পড়া বা সংগীত কোনোটাই আমার রাগ কমাতে পারে না। ভাগ্য ভালো যে রোসা কাবার্কাস টেলিফোনে চিল্লানো শুরু করল, না হলে আমার ক্রোধোন্মত্ত অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোনো জো ছিল না 'আরে, আমি তো ভাবতেছিলাম, আপনার বয়স একশ হইল, এখন তো দেখি, না, নব্বই হইছে, ভালোই হইছে কাগজটা পাইয়া।' আমি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দিলাম, 'আমাকে কি এতটাই বুড়া গাধা লাগে তোমার কাছে?' 'মোটেই না,' সে বলে, 'বরং আপনারে যে সুন্দর লাগে, আমি অবাক হইছি। এইটা জাইনা ভালো লাগে, আপনি তো আর ওই সব নোংরা পচা বুড়াগো মতো না, যারা নিজেগোরে বয়স্ক কয়, যাতে কইর‍্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে ভাবে যে তাদের শরীর-শক্তি ঠিক আছে।' কোনো রকম প্রসঙ্গ ছাড়াই সে অন্য বিষয়ে চলে যায়, 'আপনার জন্য একটা উপহার আছে।' সত্যি সত্যি আমি একটু অবাক হলাম, মেয়েটি কী বলল?

আমার এক মুহূর্তও লাগল না ভাবতে। 'ধন্যবাদ', আমি বললাম, 'কিন্তু সেটা তো ব্রিজের নিচ দিয়ে প্রবাহিত পানি।' সে বলে চলল না থেমে, 'আপনার বাড়িতে ওকে পাঠাইয়া দিমু চীনা কাগজে মুইড়া আর ডাবল বয়লারে অল্প আঁচে চন্দন কাঠ মিশাইয়া, একটাও পয়সা লাগব না।' আমি একটা কথাও বললাম না। সে একটা নির্দয় ব্যাখ্যাসহ তর্ক জুড়ে দিল, যেটা বেশ আন্তরিক মনে হলো। বলল, মেয়েটি শুক্রবারে বেশ খারাপ অবস্থায় ছিল, কেননা সারা দিন ধরে সুঁই আর সুচের নল দিয়ে ২০০টা বোতাম লাগিয়েছে আর এটাও সত্য যে আবার রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে যায়, মেয়েটি সে ভয়ও পেয়েছিল। কিন্তু তাকে বিসর্জনের ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছিল। আর আমার সঙ্গে রাত কাটানোর সময় সে উঠে বাথরুম গিয়েছিল, আমি গভীর ঘুমে ছিলাম, তাই সে আর আমাকে ডেকে তোলার সাহস করেনি। কিন্তু পরে আবার সকালে সে ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই আমি চলে গিয়েছিলাম। এই অনর্থক মিথ্যায় আমি একটু রুষ্ট হলাম। 'যা-ই হোক, তাই যদি হইয়া থাকে,' রোসা কাবার্কাস বলে চলে, 'তবে মাইয়াটা দুঃখিত। বেচারী ও আমার সামনেই খাড়াইয়া আছে। আপনি কি ওর লগে একটু কথা কইবেন?' 'না, ঈশ্বরের দোহাই,' আমি বললাম।

আমি লিখতে শুরু করেছি, এ সময় পত্রিকা অফিসের সেক্রেটারি ফোন করল। জানাল যে সম্পাদক সাহেব আমাকে পরের দিন বেলা ১১টায় দেখা করতে বলেছেন। ঠিক সময় গিয়ে হাজির হলাম। মেরামত কাজের হইহট্টগোলের আওয়াজ অসহ্য লাগছিল। হাতুড়ির আওয়াজ, সিমেন্টের ধুলায়, আলকাতরার বাষ্পে সব লন্ডভন্ড, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হলো, সম্পাদকীয় বিভাগের সবাই প্রতিদিনকার এই গোলমেলে অবস্থার মধ্যেই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্পাদক সাহেবের রুম ঠান্ডা আর নিরিবিলি, দেখে মনে হলো, আমরা এক স্বপ্নের দেশে বসবাস করছি।

মার্কো তুলিও পরিবারের তিন নম্বর সাহেব। তিনি কিশোর বয়সী ভাবভঙ্গি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন আমাকে ঢুকতে দেখে, কিন্তু ফোনের কথাবার্তা থামালেন না, ডেস্কের ওপর হাতটা বাড়ালেন হাত মেলানোর জন্য এবং ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। আমার মনে হলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিফোনের অপর পাশে আসলে কেউ নেই, শুধু শুধু আমাকে দেখানোর জন্য এই কথা বলার ভান। অচিরেই টের পেলাম, তিনি গভর্নরের সঙ্গে কথা বলছেন এবং আসলে বন্ধুস্থানীয় শত্রুর মধ্যে জটিল কথাবার্তা চলছিল তখন। আমার বিশ্বাস, আমার সামনে তাঁকে বেশ কষ্ট করে হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছিল, তার ওপর তিনি দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন ওই সরকারি লোকটির সঙ্গে।

দেখতে-শুনতে সে বেশ চটপটে। বয়স সবে উনত্রিশ পূর্ণ হয়েছে এবং চার-চারটি ভাষা জানে, তার ওপর আছে তিনটি বাইরের মাস্টার ডিগ্রি, যা তার দাদারও ছিল না, যে ছিল কোম্পানির প্রথম প্রেসিডেন্ট, শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের পদলেহন করে যে লোক একদিন হাতুড়ে সাংবাদিক হয়েছিলেন। খুব সাদাসিধে ধরনের লোক, সাংঘাতিক ভালো চেহারা আর ধীরস্থির। আলাদা করে খারাপ বলতে গেলে বলতে হয় তার কণ্ঠস্বরের কর্কশ ধ্বনির কথা। তার পরনে একটি স্পোর্টস জ্যাকেট আর কোটের বুকপকেটে একটি তরতাজা অর্কিড। পোশাকের পরতে পরতে তার দেহসৌষ্ঠবের সৌন্দর্য, কিন্তু সে পোশাক বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই নয়। সে পোশাক বরং তার রুমের বসন্তকালীন আমেজের সঙ্গেই মানায়। আমি, যে কিনা দুই ঘণ্টা ধরে পোশাক পরলাম, নিজেকে কেমন গরিব গরিব লাগল, আর রাগটা চড়ে গেল।

পত্রিকার ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তোলা স্টাফদের এক গ্রুপ ছবিতে এখনো মৃত্যুর আবছা দাগ, যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, ছবিতে তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর ক্রুশচিহ্ন। দাঁড়ানো ডান দিক থেকে তৃতীয় আমি, খড়ের টুপি মাথায়, মুক্তার টাইপিন বসানো মোটা নটের একটা টাই। আমার প্রথম রাখা কর্নেল মার্কা পুরু গোঁফ, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যেটা ছিল, আর চোখে দূরদর্শী যাজকদের মতো মেটাল রিমের চশমা, যেটা এরপর অর্ধশতাব্দী ধরে আর ব্যবহার করা হয়নি। বছরের পর বছর ধরে দেখে আসছি, ছবিটা এই অফিসে না হয় ওই অফিসে ঝোলানো। কিন্তু কেবল সেদিনই প্রথম এর মর্ম উপলব্ধি করলাম। একেবারে যাদের নিয়ে শুরু হয়েছিল পত্রিকা, সেই ৪৮ জন কর্মচারী, যাদের মধ্যে মাত্র চারজন বেঁচে আছে, আর আমাদের এই চারজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ যে, সে একাধিক খুনের দায়ে তেইশ বছরের জেল খাটছে।

সম্পাদক সাহেব ফোনের কথা শেষ করলেন, দেখলেন যে আমি ছবিটা দেখছি এবং হাসলেন। 'ওই ক্রুশচিহ্নগুলো আমি দিইনি,' বললেন। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে দেখতে কিন্তু বাজে লাগে। ডেস্কের পেছনে বসে কণ্ঠস্বর বদলে বললেন, 'অনুমতি নিয়ে বলতে হচ্ছে, আপনার মতো এতটা অনিশ্চিত মানুষ আমি আর দেখিনি।' আমাকে একটু অবাক হতে দেখে আগে থেকেই আমার উত্তরটা ধরে বললেন, 'আপনার ইস্তফাপত্রটার কারণেই এ কথা বলছি।' আমি কোনো-রকমে বললাম 'গোটা জীবনের ব্যাপার।' তিনি জবাব দিলেন, শুধু সেই কারণে এর কোনো সমাধান হলো না। তাঁর মতে, কলামটা চমৎকার। বার্ধক্য নিয়ে ওটাতে যেসব লেখা হয়েছে, এ রকম ভালো লেখা তিনি কখনোই পড়েননি, আর কথা নাই বার্তা নাই এ রকম একটা লেখা হঠাৎ থামিয়ে দেবেন, এ যে রীতিমতো আত্মহত্যার শামিল। ভাগ্য ভালো, তিনি বললেন, সম্পাদকীয় পাতাটা এর মধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যখন নয়টার *জঘন্য অমানুষটা* লেখাটা পড়ে অভিমত জানাল যে এটা ছাপানো যাবে না। কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই তার তোরকেমাদা পেনসিল নিয়ে আগা-মাথা সব কেটে ফেলল। 'আজ সকালে যখন ব্যাপারটা জানলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা প্রতিবাদলিপি পাঠিয়ে দিয়েছি সরকারের কাছে। এটা আমার কর্তব্য ছিল, কিন্তু আপনার কাছে এ কথা বলতে পারি, সেন্সর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় আমি বেশ খুশি। তার মানে এই অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে কলামটার পরিসমাপ্তি মেনে নিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নই। আপনাকে অনুনয়-বিনুনয় করছি,' তিনি বললেন, 'মাঝদরিয়ায় এভাবে জাহাজ ছেড়ে যাবেন না।' আরও চমৎকারিত্বের সঙ্গে শেষ করলেন, এখনো সংগীত বিষয়ে অনেক কিছু বলা হয়নি আমাদের।

উনি এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আমার আর সাহস হয়নি পাল্টা কিছু বলে মতের গরমিলটাকে ঘোলা করি। সত্যি বলতে কি, সমস্যাটা এই যে এমনকি এবারও জুতসই কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না একঘেয়ে বাঁধাধরা কাজটা ছেড়ে দেওয়ার এবং আর একটু সময় চেয়ে আবারও হ্যাঁ বলার সাহসটাও হলো না। নিজেকে সামলাতে হলো, পাছে না আবার আমার আবেগ-ছোটা কান্না তিনি দেখে ফেলেন। এবং আবারও এত দিনকার মতো এই এতগুলো বছর চলে যাওয়ার পরও সেই একই জায়গায় আমরা পড়ে রইলাম।

পরের সপ্তাহে আনন্দ নয়, বরং দ্বিধার বশবর্তী হয়ে ওই পশু-আশ্রমে গেলাম, অফিসের ছাপাখানার কর্মচারীরা আমাকে জন্মদিনে যে বিড়ালটা দিয়েছে, সেটা নেওয়ার জন্য। এমনিতে পশুদের সঙ্গে আমার বনে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমনটা বাচ্চাদেরও সঙ্গে আমার হয়—ওরা ঠিক করে কথা বলতে শুরু করার আগে। ভেতরে ভেতরে ওরা কেমন বোবা। ওদের অপছন্দ করি না, কিন্তু অসহ্য লাগে। ওদের সঙ্গে মিশে দেখিনি কখনো। আমার ধারণা, একজন পুরুষের তার কুকুরের চেয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গেই যে বেশি খাতির হবে, সেটাই স্বাভাবিক। পোষা কুকুর বা তার দুঃখে শরিক হওয়াটা তেমনভাবে ঠিক মানুষের ধাতে পড়ে না। কিন্তু টাইপোগ্রাফারদের দেওয়া বেড়ালটা না নেওয়া অপমানজনক হবে। তা ছাড়া বেড়ালটা জাতে সুশ্রী অ্যাংগোরা, গোলাপি চিকচিক লোম, জ্বলজ্বলে চোখ, আর তার মিউ মিউ ডাক এমন যে মনে হয়, ডাক নয় বরং শব্দ। ওরা বেড়ালটাকে একটা হালকা ঝুড়িতে এনে দিল এর বংশের নামধাম সার্টিফিকেট আর বেড়াল পরিচর্যার ম্যানুয়ালসহ, যেমন নতুন সাইকেলের সঙ্গে দেয় সাইকেলের পার্টস কীভাবে লাগাতে হবে, সেটার বর্ণনা।

সান নিকোলাস পার্কে ঢোকার মুখে পথচারীদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছিল মিলিটারি পুলিশ। এ রকম ঘটনা জীবনে দেখিনি, আর এই পড়ন্ত বয়সে এ রকম কিছু একটা দেখাটাও পীড়াদায়ক। চারজন মিলিটারি পুলিশ টহল দিচ্ছিল, সঙ্গে কমান্ডে আছে একেবারে বাচ্চা ছেলে এক অফিসার। সৈনিকেরা পার্বত্য অঞ্চলের, গাট্টাগোট্টা, ঠান্ডা মেজাজের আর গা থেকে আস্তাবলের গন্ধ বেরোচ্ছিল। অফিসার ওদের চোখে চোখে রাখছিল, আর ওদের আন্দেস অঞ্চলের চোখ-মুখ লাল হয়ে ছিল। আমার পরিচয়পত্র ও প্রেসকার্ড দেখার পর জিজ্ঞাসা করল, আমার ঝুড়িতে কী। বেড়াল, আমি বললাম। সে দেখতে চাইল। আমি ঝুড়িটা এত সতর্কতার সঙ্গে খুললাম, না জানি বেড়ালটা আবার পালায়। কিন্তু এক সৈনিক ঝুড়ির তলায় আরও কিছু আছে কি না দেখতে চাইল, আর বেড়ালটা ওকে খামচে দিল। অফিসার থামাল। 'আরে এ যে অ্যাংগোরা, দারুণ,' সে বলল। সে বেড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু একটা বলল বিড়বিড় করে এবং বেড়ালটি তাকে খামচাল না। আবার আমলও দিল না। 'বয়স কত?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'আমি জানি না', বললাম, 'আমাকে দেওয়া হয়েছে আরকি!' জিজ্ঞাসা করলাম, কারণ বিড়ালটার যে বয়স হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই আপনি খেয়াল করেছেন, ওর বয়স দশের কম হবে না। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করল, ও কীভাবে জানে, এত সব কীভাবে জানে। অফিসারটা ভদ্র ও সদালাপী হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে কথা বলতে মন চাইল না। 'আমার মনে হয়, বেড়ালটার কোনো বাড়িঘর নেই, আর কষ্ট করছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক,' সে বলল, 'ভালো করে খেয়াল রাখুন, ওকে পোষ মানানোর চেষ্টা করবেন না, বরং ওর সঙ্গে আপনি মানিয়ে চলতে পারেন কি না সেটা করে দেখতে পারেন। ওকে একা থাকতে দিন, যতক্ষণ না ও আপনার ওপর ভরসা করতে পারছে।' সে ঝুড়ির মুখটা বন্ধ করে বলে, 'আপনি কী ধরনের কাজ করেন?' 'আমি সাংবাদিক।' 'কত দিন ধরে এ কাজ করছেন?' 'একশ বছর হবে,' তাকে বললাম। 'কোনো সন্দেহ নেই,' সে বলল। সে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় জানাল এমন এক বাক্যে, যেটা সদুপদেশ, না হুমকি সেটা ঠিক বোঝা গেল না। 'নিজের দিকে খেয়াল রাইখেন।'

দুপুরবেলা ফোনের তার খুলে ফেললাম, যাতে একটু গানের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারি। অর্কেস্ট্রা ও ক্লারিওনেটে ভাগনারের অপূর্ব সুর, ডেবুসির স্যাক্সোফন আর ব্রুকনারের পঞ্চম, যা তার উল্টাপাল্টা একগাদা কাজের মধ্যে যেন এক স্বর্গীয় শীতল ছায়া। এ রকম ভাবতে ভাবতেই স্টুডিও রুমের অন্ধকারে আড়াল নিলাম। টেবিলের নিচে কিছু একটা আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে নড়েচড়ে উঠল, কিন্তু কোনো জীব বলে মনে হলো না আমার। বরং মনে হলো, অশরীরী কিছু একটা আমার পা বুঝি টেনে ধরেছে, আর আমি চিৎকার জুড়েছি ওটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। ওটা ছিল আসলে একটা লম্বা সুন্দর পেখম-লেজওয়ালা বেড়াল। অদ্ভুত ধীরগতির তার চলন, আর জাতে পৌরাণিক। মানুষ ছাড়া অন্য একটা জীবের সঙ্গে এই গোটা বাড়িতে আমি একা, এটা ভেবেই কেমন একটু ভয় করল।

গির্জার ঘড়িতে যখন সন্ধ্যা সাতটা ঢং ঢং আর গোলাপি আকাশে মাত্র একখানা নির্মল তারা, ঠিক এ রকম সময় হতাশার বিদায় ডাক ছেড়ে নদীবন্দর ছাড়ল একখানা জাহাজ, আর আমার গলা বেয়ে উগরে উঠল যেন সমস্ত প্রেমের কঠিন ফাঁস, যেগুলো ঘটতেই পারত। কিন্তু কপালে জোটেনি। আর তর সইল না। হন্তদন্ত হয়ে ফোনটার তার আবার লাগালাম ভয়ে ভয়ে। খুব খেয়াল করে চার ডিজিটের নম্বর ঘুরালাম, যাতে ভুল না হয় এবং তিনবার রিং বাজতেই যে ফোনটা ধরল, তার গলাটা চিনতে আবারও ভুল হলো না। 'শোনো,' খুব ধীরলয়ে মহিলাকে বললাম, 'আজকের সকালে ওই যে ও রকম করলাম, ওটার জন্য আমাকে মাফ করে দাও ভাই।' সে একেবারে শান্ত গলায় বলল, 'ওটা নিয়ে চিন্তা কইরেন না, আপনার ফোনের অপেক্ষায় ছিলাম।' ওকে জানালাম, আমি চাই যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি আমার জন্য রেডি হয়ে থাকুক, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে, সেভাবে আর মুখে যেন কোনো রং-পলিশ না থাকে। সে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে। 'হ...আপনি যেভাবে চান, সেভাবেই হইব, কিন্তু আস্তে আস্তে করে শরীর থেকে কাপড় খোলার মধ্যে যে একটা মজা আছে, হেইডা ভুইলা গেছেন মনে হয়। বুড্ডারা তো এইডা পছন্দ করে, কিল্লাইগা যে করে, হেইডা জানি না।' আমি জানি, বুড়োরা কেন এটা পছন্দ করে, আমি তাকে বললাম, কারণ প্রতিটি দিনই তো ওরা একটু একটু করে আরও বুড়ো হচ্ছে।

'ঠিক আছে তাহলে', সে বলল, 'আজ রাতে ঠিক ১০টার সময়, ও একটু জিরাইবার সময় পাওয়ার আগেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন

মেয়েটিকে কী নামে ডাকব? বেশ্যাখানার মালিক সর্দারনি ওর নামটা কিন্তু বলেনি। বারবার কেবল বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে করছিল। আমি ভাবছিলাম, ওকে কোনো একটা নাম দেব, নয়না বা ওই জাতীয় কিছু। এমনিতেই রোসা কাবার্কাস ওদের প্রত্যেককে একেকটা আলাদা নামে ডাকত, আবার খদ্দের বুঝে নামটা বদলে ফেলত। আমি একটু ভাবার চেষ্টা করলাম, ওদের একেকজনের নাম কী হতে পারে, আর কেন যেন প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল, ওই বাচ্চা মেয়েটির নাম একটা বড় কিছু হবে, ফিরোমেনা, সাতুর্নিনা কিংবা নিকোলাসা জাতীয় কিছু একটা। ঠিক এ রকম যখন ভাবছিলাম, তখন দেখি, মেয়েটি খাটে একটু আধ-পাশ হয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে শুল এবং দেখে মনে হলো, শরীরের গড়নের সমস্ত রক্ত বুঝি ছলাৎ ছলাৎ করে বের হওয়ার জোগাড়। আমার তো প্রায় ভিরমি খাওয়ার অবস্থা; দেখলাম বিছানার চাদর তার ঘামে জবজবে হয়ে আছে।

রোসা কাবার্কাস মেয়েটির ব্যাপারে আমাকে একটু সতর্ক করে বলে দিয়েছিল, যেন আমি একটু সাবধানে সবকিছু করি। আর মেয়েটির জন্য প্রথমবার কিনা, ওর ভয় ভয় তো করবেই। এ ছাড়া কাজটার গুরুত্ব বুঝেও মেয়েটি ভয় পেয়েছিল, আর তার ওপর টোটকা ওষুধির প্রভাব তো ছিলই। ওই টোটকার চোটে মেয়েটি এমন একটা প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল যে ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলাটা ঠিক হতো না, আর তুললেও খুব আদর করে নিচু স্বরে ডাক দিয়ে। তোয়ালে দিয়ে একটু একটু করে ওর শরীর থেকে ঘাম মুছছিলাম, আর ওর কানে ফিসফিসিয়ে দেলগাদিনার গান গাইছিলাম, রাজার ছোট কন্যা দেলগাদিনা, বাবার আদরের সোনামণি। আমি মেয়েটির শরীর থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ও আমার গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘামে ভেজা ওর শরীরের বিভিন্ন পাশ আমাকে দেখাচ্ছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে *দেলগাদিনা, আমার দেলগাদিনা, তুমি হবে প্রেমের পোশাক*। বলে বোঝানো যাবে না, এ রকম এক আনন্দের আতিশয্যে আমি ডুবে ছিলাম, কেননা ওর এক পাশ থেকে ঘাম মুছতে না-মুছতেই অন্য পাশে একটু করে আবার ঘাম দেওয়া শুরু করল, আর আমার গান তো আর থামেই না। ও যাতে ভালো করে শোনে এভাবে গাইলাম, *ওঠো, দেলগাদিনা, উঠে পরে নাও তোমার সিল্কের স্কার্ট*। শেষে যখন রাজার চাকর-ভৃত্যরা দেখল, রাজকুমারী ঘেমে অস্থির তার বিছানায়, আমার তখন মনে হলো, মেয়েটি বোধ হয় তার নামটি শোনার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইছে শেষ পর্যন্ত। এভাবেই মেয়েটির নাম হয়ে গেল, দেলগাদিনা।

অসংখ্য চুমুর দাগওয়ালা পরনের আন্ডারওয়্যারটিসহ গিয়ে বিছানায় উঠলাম মেয়েটির পাশে। প্রায় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমালাম মেয়েটির শান্ত ভঙ্গির শ্বাস-প্রশ্বাসের ধীর লয়ের সঙ্গে। মুখ-হাত না ধুয়েই ঝটপট কাপড় পরে ফেললাম, আর তখনই বাথরুমের আয়নায় দেখলাম, লিপস্টিক দিয়ে লেখা *বাঘকে শিকারের জন্য দূরে যেতে হয় না*। আগের দিন লেখাটা কিন্তু ছিল না, আর আমি চলে যাওয়ার পর কেউ যে ওই ঘরে ঢোকেনি সেটিও জানতাম। সাক্ষাৎ শয়তানের কাজ ওটা। দরজার কাছে পৌঁছাতে না-পৌঁছাতেই একটা প্রচণ্ড শব্দ করে বিজলি চমকাল আর ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে সোঁদা মাটির গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। ওখান থেকে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে পড়ার সময় পেলাম না। রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরার আগেই হুলুস্থুল বৃষ্টি শুরু হলো, যে রকম বৃষ্টি প্রতিবছর মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত গোটা শহরকে লন্ডভন্ড করে দেয়, তপ্ত বালুর রাস্তাগুলো যেগুলো নদীর দিকে গেছে, সেগুলোয় পানি উঠে একেবারে ভরাডুবি অবস্থা হয়। তিন মাস খরা থাকার পর ওই আজব সেপ্টেম্বরে বৃষ্টির বাহানা দেখে মনে হলো, কপাল খুলে গেছে।

বাসার দরজা খুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিকভাবে অনুভব করলাম, বাসায় আমি একা নই। বেড়ালটার ডোরাকাটা দাগ দেখলাম সোফা ছেড়ে লাফিয়ে ব্যালকনিতে লুকিয়ে গেল। বেড়ালটার খাওয়ার প্লেটে দেখলাম কিছু খাওয়ার উচ্ছিষ্ট, যেটা আমার দেওয়া নয়। জায়গায় জায়গায় ফেলে রাখা তার দুর্গন্ধযুক্ত মূত আর গরম গুয়ের যন্ত্রণায় গোটা ঘরে থাকা দায়। যেভাবে একদিন লাতিন শিখেছিলাম, সেই রকম কঠিন অধ্যবসায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ালবিষয়ক পড়াশোনা করলাম। ম্যানুয়াল বইয়ে লেখা আছে, বেড়াল মাটিতে গর্ত করে তার গু পুঁতে রাখে। আর যেসব বাড়িতে মাটি নেই যেমন আমারটা, সেখানে গাছের টবের মাটিতে সে কাজটা করে, কিংবা ওই জাতীয় অন্য কোনো গর্তে। সবচেয়ে ভালো হয়, একেবারে প্রথম দিন থেকে কোনো বাক্সে একটু বালু ভর্তি করে অভ্যাসটা ওদের দিয়ে করাতে পারলে। অগত্যা তা-ই করলাম। আরও লেখা আছে, নতুন কোনো বাড়িতে গিয়েই তারা জায়গায় জায়গায় বাড়ির সব কোনায় মুতে দেয় নিজেদের একটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার খাতিরে। তাহলে তো ব্যাপারটা সে রকমই দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যাপারটা ম্যানুয়াল বইয়ে লেখা নেই। বিড়ালটা তার অভ্যাসবশত সবকিছুই করে যাচ্ছিল, আর আমি ক্রমেই পরিচিত হয়ে উঠছিলাম তার অভ্যাসগুলোর সঙ্গে। কিন্তু তার গোপন কোনা আর বিশ্রামের জায়গাগুলো দেখেও তার এই অদ্ভুত হাস্যকর খেলাগুলো ঠিক ধরতে পারলাম না। আমি চাইছিলাম, ও একটা অভ্যাসের মধ্যে পড়ুক—নির্দিষ্ট সময় খাবে, চাতালে রাখা বালু দেওয়া বাক্সে হেগে আসবে, আমি ঘুমিয়ে থাকলে বিছানায় উঠবে না। আর বাড়িটা যে এমনিতেই ওর, এটার জন্য কোনো যুদ্ধবিগ্রহের দরকার নেই, সে কথাটাও ওকে বোঝাতে পারলাম না কোনোভাবেই। কোনো উপায় না দেখে আমি হাল ছেড়ে দিলাম, ওর যেমন ইচ্ছা করুক, থাকুক।

একে তো আকাশভাঙা বৃষ্টি, তার ওপর ঘন কালো মেঘ, সেই সঙ্গে বাতাসের প্রচণ্ড বেগ—বাড়িঘর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দশা। পরপর অনেকগুলো হাঁচি দিলাম, মাথাব্যথা শুরু হলো, আর সেই সঙ্গে গায়ে জ্বর, কিন্তু একটা প্রচণ্ড শক্তিতে মনোবল শক্ত করার চেষ্টা করলাম যে কখনোই কোনো দিন কোনো রকম অসুখবিসুখকে আমি প্রশ্রয় দিইনি। ফ্ল্যাটের মধ্যে কয়েকটা তামার পাত্র বসালাম চুইয়ে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির পানি জমানোর জন্য, আর এটা করতে গিয়ে বুঝলাম, গেল শীতের পর এ রকম ফুটা আরও বেড়েছে বাড়ির সিলিংয়ের। পাঠাগারের ডান পাশের তক্তা ঘেঁষে দেখলাম, পানিতে একেবারে সয়লাব অবস্থা। আমি চটজলদি করে লাতিন আর গ্রিক লেখকদের বইগুলো সরাতেই দেখি যে প্রায় এক বালতি-সমান পানি বেরিয়ে আসছে দেয়ালের একেবারে মাথায় এক ফাটা টিউব থেকে। কোনোরকমে কিছু বস্তা-কাপড় দিয়ে সেটা ঢাকার ব্যবস্থা করে এই ফাঁকে বইগুলোকে সরানোর চেষ্টা করলাম। জলের তাণ্ডব আর বাতাসের গর্জন পার্কের দিকে আরও মাত্রা ছাড়িয়েছে। হঠাৎই অদ্ভুতুড়ে ঝড়ের বেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অনবরত বিজলি চমকানোর কারণে বাতাসে কেমন একটা কড়া সালফারের গন্ধ ছড়াল, বাতাসের ধাক্কায় জানালার কাচ সব ভেঙে খানখান, আর সাগরের প্রচণ্ড চিল-চিৎকারে বাড়ির দরজার নাটবল্টু সব খুলে ফেলে ঘরের ভেতর ঢুকে হাজির। এ রকম ১০ মিনিট চলার পর একটু করে আকাশের মুখ পরিষ্কার হলো। একখানা জাঁকালো সূর্য আটকে পড়া আবর্জনায় ভরা রাস্তাগুলোকে আবার শুকনো করে তুলল এবং গরম পড়া শুরু করল।

ঝড়-বৃষ্টি শেষ হওয়ার পরও আমার মনে হচ্ছিল যে ঘরে আমি একা নই। আমার কাছে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এ রকম যে সত্য ঘটনা যে রকম আমরা ভুলে যাই, সে রকম একেবারে না-ঘটা ঘটনাগুলো আমাদের স্মৃতিতে থেকে যেতে পারে, যেন ওগুলো ঘটেই ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ঝড়ের আভাস পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ওভাবে ছুটে আসার পর থেকেই বাড়িতে আমি একা নই, আমার সঙ্গে আছে দেলগাদিনা। রাতে মনে হলো, ও আমার খুব কাছে, এতটা কাছে যে মনে হচ্ছিল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের হালকা সুর গায়ে এসে লাগছিল শোয়ার ঘরে আর তার গালের স্পন্দন আমার বালিশে এসে পড়ছিল। এ রকম ভাবতে ভাবতেই বুঝলাম, আমরা এত অল্প সময়ে কত কিছু করতে পারতাম। আমার মনে আছে, পাঠাগারের টুলের ওপর উঠে ভেবেছিলাম যে মেয়েটি থাকলে এতক্ষণে হয়তো এখানে উঠে আসত ফুলেল পোশাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য, যাতে বইগুলো নষ্ট না হয়। মনে হলো, ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় ও বুঝি দৌড়াচ্ছে, ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত, আর একেবারে হাঁটু পর্যন্ত বৃষ্টির পানিতে ভিজে একাকার। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর কীভাবে সকালের নাশতা তৈরি করত, মনে মনে সেটাও ভাবলাম; খাবারের টেবিল সাজাত আর আমি তখন ঘরের মেঝেগুলো মুছে পরিষ্কার করে রাখতাম, যাতে জলে ভেসে যাওয়া বাসাটা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে। সকালের নাশতা খাচ্ছি আমরা দুজন আর তার ঘোরলাগা দৃষ্টি আমার চোখে—আমাকে এই বুড়ো বয়সে এসে চিনলে কেন? আমাদের আগে দেখা হলো না কেন? ওকে সত্যি সত্যি বললাম, বয়সটা কত ব্যাপারটি তা নয়, বরং ওটা মনের ব্যাপার।

এর পর থেকে আমার স্মৃতিতে ও এমন প্রবলভাবে বারবার আসতে লাগল যে আমার সমস্ত চাওয়াতেই ও এসে হাজির হচ্ছিল। আমার খেয়াল-খুশিমতো ওর চোখের রং বদলে ফেলছিলাম—ঘুম থেকে ওঠার সময় জলের রং, হেসে ওঠার সময় সিরাপের রং, আর রেগে গেলে আলোর রং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রং-তামাশা অনুযায়ী ওর বয়স আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওর পোশাক পাল্টে যেতে লাগল; বিশ বছরে সবে প্রেমে পড়েছে সে রকম, চল্লিশ বছরের বেশ্যা সর্দারনির বেশে, সত্তরে গিয়ে ব্যাবিলনের রানির বেশে, আর শতবর্ষে গিয়ে একেবারে সন্ত। একসঙ্গে দুজনে গান গাইলাম পুচ্চিনির প্রেমগীত, আগুস্তিন লারার বোলেরো, কার্লোস গার্দেলের ট্যাংগো আর এ রকম ভাবতে ভাবতে আবারও এই উপলব্ধি এল যে যারা গান গায় না, তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারবে না যে গান গাওয়ার মধ্যে কী আনন্দ থাকতে পারে। আজ এটা খুব ভালো করেই জানি যে ওই দিন ওটা কোনো মায়াটায়ার ব্যাপার ছিল না, বরং সেটা ছিল নব্বই বছর বয়সে আমার জীবনের প্রথম প্রেমের অনেক অলৌকিক ঘটনার একটি।

ঘরবাড়ি আবার যখন ঠিকঠাক হলো, তখন রোসা কাবার্কাসকে ফোন করলাম। 'হায় ঈশ্বর! আমি আবার ভাবলাম, আপনি ডুইবাটুইবা গেলেন নাকি!' সে বলল চেঁচিয়ে। 'ওই যে আবার ফিরা আইলেন মাইয়াটার লগে রাত কাটানোর লাইগা, কিন্তু আগের দিনের মতো হেই একই কারবার। ছুঁইয়াও তো দেখলেন না ওরে। আমি তো আগা-মাথা কিছুই বুঝলাম না। ভালো না লাগলে কোনোই অসুবিধা নাইকো, আপনার ভালো যে লাগব, এমন তো কোনো কথা নাই। কিন্তু বড় মানুষের মতো কাম তো করা লাগব, আপনি তো বাচ্চা না।' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করতে গেলাম, কিন্তু সে কোনো রকম কথাবার্তা ছাড়াই বিষয় বদলে ফেলে বলল, 'আপনার জন্য খবর হইল, আরেকটা মাইয়া পাইছি, ওইটার চাইতে একটু বড়, কিন্তু দেখতে সুন্দর, আর হে-ও কুমারী। মাইয়াটার বাবা ওরে একটা বাড়ির বদলে বিক্রি করতে চায়, কিন্তু কথাবার্তা বইলা দামদস্তুর কমানো যাইব।' আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে পড়ার দশা। কোনো কিছু না ভেবেই অনেকটা প্রতিবাদের সুরে বললাম, 'না, আমার ওই মেয়েটিকেই লাগবে এবং বরাবরের মতোই না বললে চলবে না। কোনো রকম তর্ক-বিতর্কের সুযোগ নেই, অভিযোগও চলবে না, আমার ওকেই চাই।' ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না কিছুক্ষণ, তার পরই সে বিনত কণ্ঠে এমনভাবে বলল যে মনে হলো, নিজেকেই বলছে, 'ঠিক আছে, এইটারেই বোধ হয় ডাক্তার সাহেবরা কয়, বুড়া বয়সের ভীমরতি।'

রাত ১০টার সময় গেলাম পরিচিত একটা ট্যাক্সিচালককে নিয়ে, যাতে ব্যাটা তার অদ্ভুত সুমতি গুণে আমাকে অবান্তর প্রশ্ন না করে। সঙ্গে করে একটা হাতে বহন করা যায় এমন ভেন্টিলেটর নিয়ে গিয়েছিলাম, আর ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর্লান্দো রিবেরার আঁকা একটা ক্যানভাস, খুব পছন্দের শিল্পীর আঁকা, যাঁর ছদ্ম নাম *ফিগুরিতা*। আর ছবিটা দেয়ালে টাঙানোর জন্য নিয়েছিলাম একটা হাতুড়ি ও পেরেক। যাওয়ার পথে একটু থেমে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সুগন্ধি সাবান, আগুয়া দে ফ্লোরিদা পারফিউম আর যষ্টিমধু কিনলাম। একটা ভালো ফুলদানি আর একগোছা হলদে গোলাপ নিয়ে যেতে চাইলাম বাজে কাগজের ফুলের বদলে ওগুলোকে রাখার জন্য, কিন্তু একটা দোকানও খোলা পেলাম না, আর তাই কার না কার বাড়ির বাগান থেকে সদ্য ফোটা একগোছা স্টারফুল চুরি করতে হলো আমাকে।

বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনির নির্দেশমতো পেছনের রাস্তা দিয়ে ঢুকলাম, অ্যাকুয়াডাক্টের পাশ দিয়ে, যাতে বাগানের দরজা দিয়ে ঢোকার সময় কেউ আমাকে না দেখে। ট্যাক্সিচালক আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'গুণীজন, সাবধানে থাকবেন, এ বাড়িতে কিন্তু খুনাখুনি হয়।' ওকে উত্তরে বললাম, 'প্রেমের জন্য খুন হতে আপত্তি নেই।' উঠোনে রাজ্যের অন্ধকার, কিন্তু জানালাগুলোয় আলো ছিল, ছিল কিছু মানুষের ছায়া আর ছয়টি ঘর থেকে বিচিত্র সব সংগীতের সুর ভেসে আসছিল। আমার ভাড়া করা ঘরটিতে বেশ জোরে যেটা বাজছিল, সেটা শুনে আমি বুঝলাম যে ওটা আমেরিকার টেনোর দোন পেদ্রো বার্গাসের উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া মিগেল মাতামোরোসের একটি বোলেরো। মনে হলো, মরে যাচ্ছি। অস্থিরচিত্তে শ্বাস নিতে নিতে দরজা ধাক্কা দিলাম এবং আমার স্মৃতিতে ঠিক যেমনটা দেখেছি, যেভাবে আমি ভেবেছি, ঠিক সে রকমভাবে বিছানায় ল্যাংটা হয়ে অদ্ভুত এক স্বর্গীয় প্রশান্তি নিয়ে ফুসফুসের কাছে হাত রেখে ঘুমিয়ে আছে দেলগাদিনা।

শুতে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলটাকে একটু গোছগাছ করে রাখলাম, পুরোনো জংধরা ভেন্টিলেটরটির জায়গায় নতুন ভেন্টিলেটরটি বসালাম, আর ছবিটা দেয়ালে এমনভাবে টাঙালাম, যাতে ও শুয়ে শুয়েই বিছানা থেকে দেখতে পারে। ওর পাশে গিয়ে শুলাম, আর একটু একটু করে নতুনভাবে ওকে দেখলাম। এত চেনা সবকিছু, তার পরও। আরে...ও-ই তো আমার বাড়িতে গেল—সেই একই হাত, যেগুলো অন্ধকারে আমাকে ছুঁয়েই চিনেছিল, সেই একই পা, যেগুলো এত সতর্কিতে পা ফেলেছিল যে আমি বিড়ালের পা ভেবে ভুল করেছিলাম, আমার বিছানার চাদরের গায়ে লেপ্টে থাকা সেই একই ঘামের গন্ধ, সেই আঙুলের ডগায় পড়ে থাকা ছাঁচের ধাতব নল। অবিশ্বাস্য, ও আমার চোখের সামনে, রক্তমাংসের ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পারি, ছুঁতে পারি, কী আশ্চর্য! আমার মনে হলো, আমার স্মৃতিতেই ও বুঝি আরও বেশি জ্যান্ত, আরও বেশি বাস্তব।

সামনে দেখো, ওখানে দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে, ওকে বললাম। ওটা এঁকেছিলেন *ফিগুরিতা* যাকে আমরা প্রচণ্ড ভালোবাসি, বেশ্যালয়ের নর্তক হিসেবে তাঁর জুড়ি মেলা ভার, আর তাঁর হৃদয়টা এতই বড় ছিল যে ওই বিশাল হৃদয়ের ভালো মানুষটা খোদ শয়তানের জন্যও কষ্ট পেত। বিশাল জাহাজের পলিশের রং দিয়ে আঁকা এর ক্যানভাস জোগাড় হয়েছিল সান্তা মার্তার সিয়েরা নেভাদা পাহাড়ে বিধ্বস্ত এক উড়োজাহাজের ঝলসানো শরীর থেকে; আর যে ব্রাশ দিয়ে এটা তিনি এঁকেছিলেন, সেটা তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন তার কুকুরের চুল থেকে। আর ছবিতে যে মহিলাকে দেখা যাচ্ছে, তিনি ছিলেন এক সন্ন্যাসিনী, যাঁকে তাঁর কনভেন্ট থেকে অপহরণ করা হয়েছিল। এই সন্ন্যাসিনীকেই এই শিল্পী বিয়ে করেছিলেন। এই এখানে রাখলাম, যাতে ঘুম থেকে উঠেই তোমার প্রথমে এটা চোখে পড়ে।

রাত একটার সময় যখন বাতি নেভালাম, তখনো সে একইভাবে শুয়ে, আর ওর শ্বাস-প্রশ্বাস এতটাই ধীর লয়ে চলছিল যে হাত দিয়ে ওকে ধরে দেখলাম, জীবিত আছে কি না। ওর ধমনি-শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত এমনভাবে চলাফেরা করছিল, যেন এক প্রবহমান সংগীত আর রক্তের প্রবাহ ডালপালা মেলছিল ওর শরীরের একেবারে নির্জন অংশ পর্যন্ত এবং আবার ফিরেও আসছিল ফুসফুসে, প্রেমে পরিশুদ্ধ হয়ে।

ভোরবেলা বের হয়ে আসার আগে একটা কাগজে ওর হাতের রেখাগুলো এঁকে নিলাম, আর ওটা দিলাম দিবা সাহিবির কাছে, ওর আত্মাটা পড়বার জন্য। এমনটা জানলাম: মেয়েটি এমন ধরনের যে ও নিজে যেটা ভাবে বা মনে করে, শুধু সেটাই বলে। গতরখাটা কায়িক শ্রমের জন্য উপযুক্ত। ওর সঙ্গে এমন কারও যোগাযোগ ছিল, যে মারা গেছে এবং যার কাছ থেকে সে সাহায্য চায়, কিন্তু মেয়েটি ভুল করছে, ওর হাতের নাগালেই আছে, ও যেটা চাইছে। ওর সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই, কিন্তু মেয়েটি একদিন বিয়েথা করবে এবং বুড়ো বয়সে মারা যাবে। এখন গায়ের রং ময়লা এ রকম লোকের সঙ্গে আছে, কিন্তু লোকটা তার জীবনসঙ্গী হবে না। মেয়েটির আটটা সন্তান হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তিনটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে সে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যদি সে শুধু মনের কথা না শুনে হৃদয়ের শাসনে চলে, তাহলে অনেক অর্থের মালিক হবে এবং চল্লিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর বয়সে গিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক কিছু পাবে। অনেক ঘোরাঘুরি আছে জীবনে। ওর জীবনে দু-দুবার ভাগ্য ফিরবে এবং নিজের নিয়তিটাকে ঠিক করার কাজটা তার। মেয়েটি এমনিতে খুব খেয়ালি স্বভাবের, এটা-ওটা অনেক কিছু করতে চায়, কিন্তু হৃদয়ের কথা না শুনলে ভুল করবে।

ভালোবাসার কষ্টে জ্বলেপুড়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটা মেরামত করা ছাড়াও অনেক দিন ধরে আর্থিক অনটনসহ নানা অজুহাতে জমে থাকা এটা-ওটা নানা কাজ সারলাম। কোনটার পর কোনটা পড়েছিলাম, সেই তালিকা মিলিয়ে একটার পর একটা বই দিয়ে পাঠাগারটা নতুন করে গোছালাম। ঐতিহাসিক স্মারক পিয়ানোটা জলাঞ্জলি দিলাম, ১০০টার বেশি শাস্ত্রীয় সংগীতের রোলসহ এবং আমার কাছে যেটা ছিল, সেটার চেয়েও ভালো দেখে একটা পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার কিনলাম, আর সঙ্গে অতি বিশ্বস্ত লাউড স্পিকার, যেটার কারণে বাড়িটার চৌহদ্দি বেড়ে গেল। প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও এত বয়সে বেঁচে থাকার অলৌকিকত্বটা আমাকে রক্ষা করল।

ছাই-ভস্ম অবস্থা থেকে বাড়িটা আবার উঠে দাঁড়াল, আর আমি দেলগাদিনার প্রেমে এতটাই হাবুডুবু খেতে লাগলাম, যে রকমটা আমার জীবনে এর আগে কোনো দিনই ঘটেনি। ওর কারণেই প্রথমবারের মতো আমি আমার স্বাভাবিক সত্তা নিয়ে নিজের মুখোমুখি হলাম, যদিও ওদিকে আমার বয়স নব্বই-এ গিয়ে ঠেকেছে। আর এর পেছনে কারণ বলতে সে-ই। আবিষ্কার করলাম, প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে আমার আচ্ছন্নতা ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা, প্রতিটি শব্দের জন্য সঠিক শৈলীটা যৌক্তিক মনের উপযুক্ত ফল নয়, বরং উল্টোটা, আমার স্বভাব-প্রকৃতির অস্বাভাবিকতাকে ঢেকে রাখার জন্য ভান-মেশানো একটা পদ্ধতিগত নিজস্ব উপায়। দেখলাম যে আসলে আমি স্বভাবের দিক থেকে ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক নই বরং আমার যাবতীয় গাফিলতির বিপরীতে একজাতীয় প্রতিক্রিয়ার বশে আমি নানা কিছু করি, এই যে আমাকে দেখে লোকে মনে করে, আমি বেশ দয়ালু গোছের, আসলে আমি তো আমার হীনম্মন্যতাকে ঢেকে রাখি, আমার মনমানসিকতা খারাপ বিধায় লোকে ভাবে, আমি বিচক্ষণ, আমার অবদমিত ক্রোধের কাছে মাথা না নোয়ানোর জন্যই আমি এ রকম বন্ধুপ্রতিম, সময়ানুবর্তী দেখাই, কিন্তু আসলে আমি অন্য মানুষের সময়ের ব্যাপারে থোড়াই চিন্তা করি। সবশেষে আবিষ্কার করলাম যে আসলে প্রেম আত্মার কোনো ব্যাপার নয়, বরং এটা হলো রাশির ঘোরফের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন যেন একটু বদলে গেলাম। আবার ঘরে ফিরে ধ্রুপদি সাহিত্যের বইগুলো পড়ার চেষ্টা করলাম, যেগুলোর সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, কিন্তু পড়তে পারলাম না। রোমান্টিক বইগুলোর মধ্যে একসময় রীতিমতো ডুবে থাকতাম, কিন্তু মায়ের কাছে কঠিন বকাঝকা খাওয়ার পর ওগুলো পড়া বাদ দিলাম আর ওগুলো পড়তে পড়তেই চেতনায় এই বোধ জাগ্রত হয়েছিল যে প্রেমে মিলন নয় বরং বিরহেই সুখ, আর সেই বিরহের প্রেমই দুর্মরভাবে তাড়িত করেছে জগতের সবাইকে বারবার। পছন্দের গানগুলো শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাজ হলো না, নিজেকে কেমন একটু নিস্তেজ আর বুড়ো বুড়ো লাগল। কোনো একটা কিছু করে নিজেকে আনন্দ দেওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টা করতে লাগলাম।

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম, এই বিরামহীন মাথাঘোরা মার্কা অবস্থায় নিজেকে যে ঠেলে দিলাম, এখন এর প্রতিকার কী! খামখেয়ালি মেঘের রাজ্যে ভাসতে থাকলাম, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বললাম, মিছে এই আশায়, যদি জানা যায় আমি কে। আমি যে কী করছিলাম, আর কেনই বা করছিলাম, আর আমিই বা কে! সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে এমন একটা অবস্থা, মনে হলো ছাত্রজীবনে যে রকম একবার মিছিল করেছিলাম ইট-পাথর-বোতল নিয়ে, সেরকম মিছিলের সামনের সারিতে যাতে না যেতে হয়, তার জন্য কী প্রচণ্ড চেষ্টায় কোনো রকমে আমার সামনে একটা সাইনবোর্ড তুলে ধরে নিজের এই সত্যটা প্রতিপন্ন করেছিলাম সেদিন : *আমি প্রেমের কাঙাল*।

দেলগাদিনা ঘুমিয়ে আছে, এ দৃশ্যটা মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারছিলাম না। এদিকে আমার রবিবাসরীয় কলামের ভাবসাব বদলে ফেললাম কোনো রকম খেদ ছাড়াই। বিষয়বস্তু যা-ই হোক, যা কিছু লিখলাম, সবই তার জন্য, লিখতে লিখতে তার জন্য হাসলাম, কাঁদলাম, প্রতিটি শব্দে আমার জীবন ভেসে যাচ্ছিল। ব্যক্তিগত কলাম যে রকম লেখা হয়, সেই চিরাচরিত ঢঙে না গিয়ে আমার কলামের লেখাগুলো হয়ে গেল একেকটা প্রেমপত্র, সবাই যাতে ভাবে যে আরে এ তো আমার কাহিনি। পত্রিকা অফিসে প্রস্তাব করলাম, লিনোটাইপে অক্ষর না সাজিয়ে ফ্লোরেন্সীয় রীতিতে আমি যেভাবে হাতে লিখি, সেভাবে লেখা ছাপানোর জন্য। প্রধান সম্পাদক, বলার অপেক্ষা রাখে না, ভাবলেন যে এ আমার আরেক বুড়া বয়সের ভীমরতি, কিন্তু ব্যবস্থাপনা সম্পাদক তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক প্রবাদবাক্যে, যা এখনো প্রচলিত; 'ভুল কোরো না: শান্তিপ্রিয় পাগলেরা কিন্তু ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শী।'

পাঠকেরা কিন্তু তাৎক্ষণিক উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া জানাতে ভুল করল না। ভালোবাসায় আপ্লুত অসংখ্য চিঠি আসতে লাগল পাঠকদের কাছ থেকে। রেডিওর খবরে আশপাশের নানা সমস্যার কথার পাশাপাশি আমার কলামের কিছু কিছু পাঠ শোনানো হলো, লেখার প্রতিলিপি বা কার্বনকপি তৈরি হয়ে বেআইনি সিগারেটের মতো সানব্লাস সড়কের কোনায় কোনায় বিক্রি হতে লাগল। একেবারে শুরু থেকেই কলামগুলোয় এটা স্পষ্ট ছিল যে আমি নিজের কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি, কিন্তু আমি প্রবণতাকে শুধু লেখালেখির সময়টাতেই প্রশ্রয় দিলাম, সর্বদা নব্বই বছর বয়স্কের কণ্ঠস্বরে যে এখনো ভাবনাচিন্তায় বুড়ো হয়নি। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যথারীতি কোনো রা করল না এবং কেউ এ-পক্ষ নিল তো আবার অন্যরা ও-পক্ষ, এমনকি যাদের কথা বলার কথা নয়, সেই চিত্রকলাবিদেরাও বিতর্কে জড়িয়ে গেলেন আমার হাতের লেখার ছাপা নিয়ে তাদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্যসহ। মতপার্থক্যটা তাঁদেরই সৃষ্টি, বাগ্‌বিতণ্ডা লাগিয়ে নস্টালজিয়ায় হাবুডুবু খেতে লাগল সবাই।

বছর না ঘুরতেই রোসা কাবার্কাসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ওই রুমের ভেতর একটা ইলেকট্রিক ফ্যান, টয়লেটের এটা-সেটা এবং ওই রুমের জন্য আরও যা যা দরকার এমন কিছু যদি ভবিষ্যতে আনি, সেগুলো রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এ ব্যবস্থায় আমি আসব রাত ১০টায়, প্রতিবারই মেয়েটির জন্য নতুন কিছু একটা নিয়ে, কিংবা আমাদের দুজনের জন্য কিছু একটা নিয়ে এবং কিছু সময় কেটে যাবে আমাদের গোপন এসব আসবাব দিয়ে রুমটা সাজাতে গিয়ে আমাদের রাতের নাটকের জন্য। রুমটা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় প্রতিবার ভোর পাঁচটার আগে, আমি সবকিছু তালাচাবি মেরে আসব। এভাবে শোয়ার ঘরটি আর দশজনের বিষাদ প্রেমবিহারের জন্য এর পুরোনো লক্ষ্মীছাড়া দশায় ফিরে যাবে। একদিন সকালে শুনলাম যে রেডিওর সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপস্থাপক মার্কোস পেরেস্ এখন থেকে নাকি প্রতি সোমবার তার অনুষ্ঠানের খবর পর্বে আমার রবিবাসরীয় কলাম পাঠ করবে। আমার বমি বমি ভাব কাটতেই সভয়ে বললাম, এখন জানো দেলগাদিনা, খ্যাতি হলো মুটকি বেটির মতো, যে তোমার সঙ্গে শোয় না, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখবে যে ও বিছানায় পায়ের কাছে শুয়ে আছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন সকালবেলা আমি থেকে গেলাম রোসা কাবার্কাসের সঙ্গে নাশতা খাওয়ার জন্য, যাকে আমার আর অতটা বুড়ো মনে হচ্ছিল না, কঠিন শোকে তার চেহারা-সুরত কালো হয়ে আছে, তার চোখের ভ্রুগুলোও কালো নেকাবে ঢাকা। তার নাশতার টেবিল ভরা থাকে বলেই শুনেছি, এত গোলমরিচ ছিল যে আমার চোখ দিয়ে কেবলই পানি পড়ছিল। জ্বালাধরা প্রথম কামড়ের পর আমি বললাম, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল আমার দুই চোখ, আজকে আর পূর্ণিমার দরকার নেই, এমনিতেই পাছা জ্বলবে। 'সমালোচনা কইরেন না', সে বলল। 'আরে এখনো পাছা আছে বলেই তো জ্বলছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।'

দেলগাদিনার নাম শুনে সে অবাক হলো। 'ওটা তো ওর নাম নয়, সে বলল, ওর নাম হলো...' 'বলার দরকার নেই।' আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, 'আমার কাছে সে দেলগাদিনা।' সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ও তো আপনারই কিন্তু নামটা আমার কাছে কী রকম মূত্রবর্ধক ওষুধের মতো লাগতাছে।' মেয়েটি আয়নায় বাঘবিষয়ক যে উক্তিটা লিখেছিল, সেটা বললাম। 'এটা এই মাইয়ার কাজ না', রোসা বলে, 'ও তো লেখাপড়া জানে না।' তাহলে কে লিখল? সে কাঁধ ঝাঁকায়; হয়তো এমন কেউ যে ওই রুমে মারা পড়ছে।

নাশতার টেবিলের ওই আলাপগুলোয় আমি সুযোগ পেয়ে রোসা কাবার্কাসের সঙ্গে মন খুলে কথা বললাম, দেলগাদিনা যেন ভালো থাকে, ওকে দেখতে যেন আরও ভালো লাগে—এসব ভেবে কিছু অনুরোধ-আরজি জানলাম। একটুও না ভেবে সে রাজি হয়ে গেল সবকিছুতে, স্কুলছাত্রীর দুষ্টুমি তার চোখে-মুখে। কী তাজ্জব! সে বলল, 'আমার তো মনে হইল, আপনি ওরে বিয়া করতে চাইতেছেন।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বলল, 'ওরে বিয়া করলেই তো পারেন? আমি তো রীতিমতো সত্যি বলতাছি', সে বলে, 'পয়সা কম খরচ হইব। যদিও আপনার এই বয়সে সমস্যা হইল আপনি পারবেন কি পারবেন না, কিন্তু আপনি আমারে কইছেন, হেই সমস্যা মিইট্যা গেছে।' তাকে আর কথা বাড়াতে দিলাম না, ভালোবাসা না পেলে একমাত্র সান্ত্বনা হলো সেক্স।

সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। 'হায়রে আমার পণ্ডিত, আমি জানতাম যে আপনি সত্যিকারের মরদ, হগল সময়ই ছিলেন এবং খুশি হইলাম যে আজও হেই রকম আছেন, অথচ আপনার লগে আশপাশের সব শত্রু তো তাদের অস্ত্র ফেরত দিয়া দিতেছে। এর লাইগাই তো হেরা আপনারে নিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত কথা কয়।' মার্কোস পেরেস্রের অনুষ্ঠানের কথা তো শুনছেন? সবাই তো শোনে তার অনুষ্ঠান, বিষয় বদলে আমি বললাম। কিন্তু সে ছাড়ল না। অধ্যাপক কামাচো ও অধ্যাপক কানোও তাদের *লা ওরা দে তোদো উন পোকো* অনুষ্ঠানে গতকাল বলেছেন, 'পৃথিবী আর আগের মতো নেই।' 'কারণ আপনার মতো মানুষের সংখ্যা নাকি খুব কম।'

সেই সপ্তাহের শেষে দেখলাম দেলগাদিনার সর্দি-জ্বর হয়েছে। রোসা কাবার্কাসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘরে কোনো দাওয়াই-পথ্য আছে কি না এবং সে প্রাথমিক চিকিৎসার একটা বাক্স নিয়ে এল রুমে। দুই দিন গেলেও দেলগাদিনা বিছানায় চিত হয়েই থাকল এবং তার বোতাম সেলাইয়ের কাজে যেতে পারল না। ডাক্তার সাধারণ সর্দি-জ্বরের ওষুধ দিয়ে বলেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এমনিতে মেয়েটির শরীর-স্বাস্থ্যের যা হাল, তাতে তিনি একটু চিন্তিত। ওকে আর ডাকলাম না কয়েক দিন, খুব মনে পড়ল তার কথা এবং এই ফাঁকে রুমটা এটু গোছগাছ করলাম ওকে ছাড়া।

আলবারো সেপেদার ছোটগল্পের বই *তোদোস এস্তাবামোস আ লা এস্পেরার* জন্য আঁকা সেসিলিয়া পোররাসের স্কেচও নিয়ে এলাম। রোমা রোলাঁর ছয় খণ্ডের *জঁ ক্রিস্তফ* কিনলাম বিনিদ্র রাতগুলো পার করার জন্য। এবং দেলগাদিনা শেষ পর্যন্ত অসুখ থেকে উঠে ওই ঘরে ফিরল, যখন আরাম-আয়েশে বসে কাটাবার সময় জুটল, সুগন্ধি কীটনাশক ওষুধে ঘর ম ম, গোলাপ-লাল রঙের দেয়াল, শেড দেওয়া ল্যাম্প, ফুলদানিতে তাজা ফুল, আমার প্রিয় বইগুলো, বিভিন্ন কোণে টাঙানো আমার মায়ের আঁকা ছবিগুলো, আধুনিককালের রুচি অনুযায়ী। পুরোনো রেডিওটার জায়গায় একটা শর্টওয়েভ মডেলের রেডিও রেখেছি আর তাতে শাস্ত্রীয় সংগীতের একটা চ্যানেল ধরানো, যাতে দেলগাদিনা মোৎসার্টের কোয়ার্টেট শুনতে শুনতে ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাসটা করতে পারে। কিন্তু এক রাতে দেখলাম, ওটাতে জনপ্রিয় বোলেরো গানের চ্যানেল বাজছে। এটা মেয়েটির পছন্দ, কোনো সন্দেহ নেই। মন খারাপ না করেই ব্যাপারটা মেনে নিলাম। একসময় তো আমিও ওসব শুনতাম। পরের দিন বাড়ি ফেরার আগে, ওর লিপস্টিক দিয়ে আয়নায় লিখলাম : *ও মেয়ে, আমরা পৃথিবীতে একা।*

এই সময়টায় কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা হলো আমার, যেন মেয়েটির বয়স বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। রোসা কাবার্কাসকে বললাম সে কথা। সে বলল, এ খুবই স্বাভাবিক। ৫ ডিসেম্বর তার বয়স পনেরো হবে—সে জানাল। খাঁটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনু রাশির জাতিকা ওর আবার জন্মদিন থাকতে পারে ভেবে আমার কেমন যেন একটু লাগল। কী উপহার দিই তাকে? একটা সাইকেল,—বলল রোসা কাবার্কাস। তাকে প্রতিদিন শহরের এমাথা-ওমাথা করতে হয় বোতাম সেলাই করার জন্য। পেছনের ঘরটায় আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাল দেলগাদিনা যে সাইকেলটা ব্যবহার করে সেটা, দেখে মনে হলো, এক প্রিয়া ফেলে দেওয়া এ রকম একটা ভাঙাচোরা জিনিস ব্যবহার করছে, তা মানায় না। তার পরও সাইকেলটা দেখে এই মূর্ত বিশ্বাস হলো, দেলগাদিনা বলে সত্যিই কেউ আছে।

ওর জন্য সবচেয়ে ভালো সাইকেলটা কিনতে গিয়ে সেটা চালানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। এমনি এমনি দোকানের ভেতর এদিক-ওদিক চালালাম কয়েকবার। দোকানদার যখন জিজ্ঞাসা করল আমার বয়স, আমি ফাজলামি করে উত্তর দিলাম: প্রায় একানব্বই। আমি মনে মনে যেটা চাইলাম, দোকানদার সেটাই বলল—হুঁ, কিন্তু আপনাকে তো আরও বিশ বছরের ছোট লাগে। আমি নিজে ঠিক বুঝিনি, কীভাবে স্কুলবালকের ভাবগতিক এখনো বজায় রেখেছি। আমি যে খুশিতে ডগমগ, সেটা টের পেলাম। খুশিতে গান গাইতে শুরু করলাম। প্রথমে নিজে নিজে, গুনগুনিয়ে। তার পরই গলা ছেড়ে বিখ্যাত কারুসোর মতো ভঙ্গিমায়, বারোয়ারি বাজারের জবরজং দোকান আর ট্রাফিকের চিল্লাচিল্লির ভেতর। লোকজন মজা পেয়ে আমার দিকে তাকাল, ডাকল, চাপাচাপি করল হুইল চেয়ারে কলম্বিয়া রাউন্ড সাইকেল রেসে অংশ নিতে। সুখী নাবিকের মতো স্যালুট দিয়ে আমি জবাব দিলাম গান না থামিয়েই। সে সপ্তাহে ডিসেম্বরকে নিবেদন করে আমি আর একটা সাহসী কলাম লিখলাম: *সাইকেল চড়ে নব্বই বছর বয়সে কীভাবে হাসিখুশি থাকবেন*।

দেলগাদিনার জন্মদিনের রাতে আমি পুরো গানটা গাইলাম ওর জন্য। আর ওর সারা শরীরে চুমু খেলাম, যতক্ষণ না আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। ওর শিরদাঁড়া, প্রতিটি হাড়, একেবারে নিচের অসাড় নিতম্ব পর্যন্ত—যে পাশে তিল আছে সেখানটায়—তার অক্ষয় হৃৎপিণ্ডের পাশটায়। চুমু খেতে খেতে ওর শরীরে উত্তাপ ছড়াল। একটা বুনো, পোষ না-মানা সৌরভ বেরোল শরীর থেকে। তার গায়ের প্রতিটি ইঞ্চি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। আর প্রতিটি কাঁপনে পেলাম এক আলাদা উত্তাপ, অনন্যতার আস্বাদ ভিন্ন গোঙানি। আর তার গোটা শরীর ভেতরে প্রতিফলিত হলো বীণার সুর নিয়ে। তার স্তনের বোঁটাগুলো উঁচু হয়ে উঠল টানটান কোনো পরশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াই। ওই প্রহরে আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, যখন আমার কানে এল সাগরের রাশি রাশি ঢেউয়ের আওয়াজের মতো কিছু একটা। আর গাছগাছালিতে কী যেন একটা ভয়, আশঙ্কা, যা আমার হৃদয় চিরে গেল। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় লিখলাম: *দেলগাদিনা, ভালোবাসা আমার, ক্রিসমাসের দমকা বাতাস এসেছে আজ দুয়ারে।*

বহু আগে এ রকমই এক সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার সময় এমনটা হয়েছিল আমার পথ রোধ করা বাতাসে, যা আমার সুখতম স্মৃতিগুলোর একটি। কী হলো আমার? হতভম্ব হয়ে শিক্ষক বললেন, আরে বাছা, দেখছ না, কী রকম বাতাস?

দেলগাদিনার পাশ থেকে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পর ঠিক এমনটা আবারও হলো আমার আশি বছর পর। যথাসময়ে হাজির সেই একই ডিসেম্বর আর তার নির্মল আকাশ, বালুঝড়, আমচকা ফুলে উঠে বনবন করে ঘোরা বাতাস, যাতে উড়ে যাওয়ার অবস্থা ঘরবাড়ির চালা আর স্কুলবালিকাদের স্কার্ট। এমন একটা সময়, যখন শহর ভুতুড়ে সব অনুনাদে ফেটে পড়ে। এ রকম মৃদুমন্দ বাতাসের রাতে, এমনকি পাহাড়ের ওপরের মহল্লাগুলো থেকেও বারোয়ারি বাজারের চিৎকার-চেঁচামেচি আসে, যেন ওগুলো সব পাশের কোনো গলিতে ঘটছে। দূরের বিভিন্ন বেশ্যালয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বন্ধুদের তাদের গলার আওয়াজ চিনে খুঁজতে যাওয়া ডিসেম্বরের দমকা বাতাস সহজ করে দেয় বললেই চলে।

যা হোক, দমকা বাতাস বাজে খবরটাও নিয়ে এল, দেলগাদিনা আমার সঙ্গে ক্রিসমাস করতে পারবে না। সে তার বাড়ির লোকজনের সঙ্গেই ক্রিসমাস কাটাবে। এ জগতে এমন কিছু যদি থেকে থাকে যেটা আমার অপছন্দ, তা হলো এ রকম বাধ্যতামূলকভাবে উৎসবে শরিক হয়ে সবার সঙ্গে মিলে হাসিমুখে কান্নাকাটি করা, আগুন জ্বালানো, অর্থহীনভাবে সবাই মিলে আনন্দ-গীত গাওয়া, পাতলা কাগজের ভাঁজ খেলা, নকশা তৈরি করা, যার সঙ্গে দুই হাজার বছর আগে এক পর্ণ কুটিরে জন্ম নেওয়া শিশুটির কোনোই সম্পর্ক নেই। তার পরও ক্রিসমাসের রাতে আমি নস্টালজিয়ায় ভুগে ওই রুমে গেলাম, দেলগাদিনা যদিও নেই। ভালোমতো ঘুমালাম এবং ঘুম থেকে জেগে দেখি, পাশেই একটা রেশমি ভালুক, যে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মরুভালুকের মতো হাঁটছিল। তার গায়ে একটা কার্ডে লেখা: *কুৎসিত বাবার জন্য।* রোসা কাবার্কাস আমাকে বলেছিল, দেলগাদিনা আয়নায় লেখা আমার কথাগুলো দেখে একটু একটু পড়ালেখা শুরু করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আমারও মনে হলো, ওর হাতের লেখাটা দেখার মতো। কিন্তু বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনি যখন বলল, ওই ভালুকটা তারই উপহার, তখন আমার কল্পনাটা ভেঙে গেল। তাই বছরের শেষ দিনটা কোথাও না গিয়ে বাসাতেই থাকলাম এবং আটটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। কোনো রকম তিক্ততা ছাড়াই ঝটপট ঘুমিয়ে গেলাম। বেশ খুশি খুশি লাগল, কেননা ১২টা বাজতেই ঢং ঢং কান ফাটানো ঘণ্টাধ্বনি, কলকারখানা আর বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাইরেন, জাহাজের বিলাপ, আতশবাজি আর রকেট-বোমার সশব্দ বিস্ফোরণের মধ্যে আমি টের পেলাম, দেলগাদিনা চুপিসারে পা টিপে টিপে এল, আমার পাশে শুল এবং আমাকে চুমু খেল। এতটাই বাস্তব, যে ওর যষ্টিমধু ঘ্রাণ আমার মুখে রয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

নতুন বছরের শুরুতে আমরা পরস্পরকে এমনভাবে চিনতে-জানতে শুরু করলাম যে মনে হয়, আমরা না ঘুমিয়েই বহুদিন কাটিয়ে দিয়েছি একসঙ্গে। আমি নিজের কণ্ঠস্বরে একটা ভাব খেয়াল করলাম, যেটা সে না জেগেই শুনতে পায়, আর সে জবাব দেয় তার শরীরের স্বভাবসুলভ ভাষায়। তার মনের অবস্থাটা ধরা যায় তার শোবার ভঙ্গি দেখে। শুরুতে যে ছিল ক্লান্ত-শ্রান্ত ও অমার্জিত, আস্তে আস্তে তার মধ্যে এক আত্মিক প্রশান্তি এল, আর তার চেহারা খুলতে লাগল এবং ঘুম গেল বেড়ে। তাকে আমার জীবন সম্পর্কে বললাম, কানে কানে আমার রবিবাসরীয় কলামের প্রথম কিস্তিটা পড়ে শোনালাম, এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেটা ছিল কেবল একজনেরই কথা।

এই সময়টায় একদিন তার বালিশের কোণে আমার মায়ের এক জোড়া পান্নার কানের দুল রেখে এলাম। আমাদের পরের সাক্ষাতেই ও সেটা পরল, কিন্তু ওকে ওগুলো মানাল না। তারপর তার গায়ের রঙের সঙ্গে মানায়, এ রকম আরেক জোড়া নিয়ে গেলাম। একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম : প্রথমে যে জোড়া এনেছিলাম, সেগুলো ঠিক তোমার সঙ্গে এবং তোমার চুলের সঙ্গে মানায় না। এগুলো বরং ভালো লাগবে। আমাদের পরের দুই সাক্ষাতে সে কোনো রকম কানের দুল আর পরেনি। কিন্তু তৃতীয় সাক্ষাতে দেখলাম, আমি যেটা পরে এনে দিয়েছি, সেগুলো পরেছে। এভাবে বুঝতে শুরু করলাম যে ও ঠিক আমার নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে মান্য করে না, কিন্তু একটা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, আমাকে খুশি করার জন্য। তত দিনে ওই ধরনের সাংসারিক জীবনের সঙ্গে আমি এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আর ল্যাংটা হয়ে না ঘুমিয়ে বরং চীনা পাজামা পরে শুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলাম, যেটা পরা বন্ধ করেছিলাম; কেননা আমার সঙ্গে এমন কেউ ছিল না যে গা থেকে ওগুলো খুলে নেবে।

ওকে আঁতোয়ান দ্য স্যাঁত-একসুপেরির লেখা *ছোট রাজকুমার* পড়ে শোনাতে লাগলাম, যে ফরাসি লেখককে ফরাসিদের চেয়েও বাইরের পৃথিবীর মানুষ ঢের বেশি চেনে। জেগে জেগে শুয়ে থেকে এতটা মনোযোগ আর আনন্দ নিয়ে কোনো বই পড়া আর সে শোনেনি। এমনকি আমাকে পরপর দুই দিন ওখানে গিয়ে বইটা পড়ে শোনাতে হলো তাকে। এভাবে আরও পড়ে শোনালাম পেরোর *গল্পগুচ্ছ*, *স্যাক্রেড হিস্ট্রি*, বাচ্চাদের জন্য সহজ করে লেখা *আরব্য রজনী* এবং এক বই একেক রকম হওয়ায় খেয়াল করলাম, তার ঘুমের মাত্রায়ও তারতম্য ঘটছে বইয়ের রকমফের অনুযায়ী। যদি দেখলাম যে একেবারে ঘুমের গভীর দেশে চলে গেছে, অমনি বাতি নিভিয়ে তাকে জড়িয়ে ঘুম দিলাম একেবারে ভোরবেলায় মোরগের ডাক শোনা পর্যন্ত।

ভালো লাগায় বুঁদ হয়ে একটু একটু করে ওর চোখের পাতায় আলতো চুমু খেতাম, আর এক রাতে তো এমন হলো যেন আকাশে আলো জ্বলল : সেই প্রথম সে হাসল। এরপর কোনো কারণ ছাড়াই, বিছানায় গড়াগড়ি খেল সে, আমার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে জের টেনে বলল : শামুকদের কাঁদিয়েছিল কিন্তু ইসাবেল। যাক, ওর সঙ্গে একটু আলাপচারিতা হবে এই খুশিতে, একই স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সেটা কাদের ছিল? সে কোনো উত্তর দিল না। তার কণ্ঠস্বরে একটা ইতরবিশেষ ছাপ ছিল, যেন এটা তার নয়, বরং ওর ভেতরের অন্য কারও কণ্ঠস্বর। এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভেতর যে তিল পরিমাণ সন্দেহ ছিল সেটাও উবে গেল : ও ঘুমিয়ে থাকলেই বরং ভালো।

আমার যত সমস্যা তৈরি হলো বেড়ালটাকে নিয়ে। কিছু খাবে না ব্যাটা, অসামাজিক এবং সচরাচর যেখানটায় থাকে, বাড়ির সে কোনায় দুই দিন পড়ে রইল, কোনো নড়াচড়া নেই এবং আহত পশুর মতো আমাকে থাবা মারতে গেল, যখন আমি তাকে হালকা ঝুড়িটায় ভরতে গেলাম, যাতে দামিয়ানা ওকে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে পারে। বিড়ালটাকে শান্ত করার জন্য দামিয়ানার এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাকে নিয়ে গেল ওখানটায়, একটা মোটা ক্যানভাসের থলিতে, আর সে মোটেই যেতে চাইছিল না। কিছুক্ষণ পরই সে পশু-আশ্রম থেকে ফোন করে জানাল যে বিড়ালটাকে থলি থেকে বের করতে তো হবে এবং চিকিৎসালয়ের লোকজন তার আগে এর জন্য আমার অনুমতি চাইছে। কেন? কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়ালটা অনেক বুড়ো, দামিয়ানা জানাল। আমি রাগে জ্বলতে জ্বলতে ভাবলাম যে ওরা আমাকে বেড়ালে ঠাসা কোনো ওভেনে জ্যান্ত রোস্ট করতেই চায় বুঝি। দ্বিমুখী সমস্যার ভেতর পড়লাম মনে হয়; একদিকে বিড়ালের প্রতি ভালোবাসা বলতে কোনো কিছু যেমন কোনো দিন গজায়নি, আবার অন্যদিকে বেড়ালটা বুড়ো বলে ওকে এভাবে মেরে ফেলার নির্দেশও দিতে পারি না। ওই ম্যানুয়ালটার কোথায় এটা লেখা আছে?

এ ঘটনায় আমি এতটাই বিচলিত হলাম যে রবিবাসরীয় কলামের জন্য নেরুদার কাছ থেকে ধার নিয়ে *বেড়াল কি বাঘের মাসি?* শিরোনামে একটা লেখা লিখলাম। লেখাটা এতটাই আলোড়ন ফেলল যে পাঠকেরা আবারও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যার যার কথা বলতে লাগল। বিড়ালের পক্ষের একদল আর অন্য দল এর বিপক্ষে। এ রকম পাঁচ দিন চলার পর এই মত নির্ধারিত হলো যে জনস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে বিড়ালটাকে শেষ করাটা জায়েজ হলেও বেড়ালটা বুড়ো, এই অজুহাতে কিছু করা যাবে না।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মাঝেমধ্যে জেগে থাকি এই ভয়ে যে এই বুঝি কেউ আমাকে ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে দেখবে। এক রাতে তার ছোঁয়া অনুভব করলাম, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আমার প্রশান্তি ফিরিয়ে আনল : *Figlio mio poveretto*। ঠিক একই রকম অনুভূতি হয়েছিল আমার এক রাতে দেলগাদিনার রুমে যখন আনন্দের আতিশয্যে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলাম, সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম যে ও আমাকে ছুঁয়েছে। কিন্তু না, আঁধার রাতে রোসা কাবার্কাস ছিল সেটা। কাপড় পরে আমার সঙ্গে আসেন, বলেছিল সে। সাংঘাতিক একটা সমস্যা হয়েছে আমার।

আসলেই তাই, ব্যাপারটা আমার কল্পনার চেয়েও বেশি সাংঘাতিক ছিল। বেশ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ এক খদ্দেরকে প্যাভিলিয়নের প্রথম রুমটাতে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে। খুনি পালিয়েছে। বিশালদেহী লাশের গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু জুতা পরা। রক্তাক্ত বিছানায় সেদ্ধ মুরগির মতো ফ্যাকাশে হয়ে আছে। ওই রুমে ঢুকতে না-ঢুকতেই লোকটাকে চিনলাম : জেএমবি তার নাম। প্রভাবশালী ব্যাংকার। সুন্দর আদবকায়দা, ভালো স্বভাব, বেশভূষা আর সর্বোপরি একটা ঝকঝকে বাড়ির জন্য সুবিদিত। গলায় দুটি ঠোঁটের মতো আঘাতের বেগুনি দাগ, আর পেটের গভীর ক্ষত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল। লাশটা তখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েনি। তার আঘাতের চেয়েও যে ব্যাপারটা আমাকে নাড়া দিল সেটা হলো, লোকটার লিঙ্গে একটা কনডম লাগানো ছিল। দেখে যদ্দুর মনে হয় অব্যবহৃত, আর লিঙ্গটা মৃত্যুর আঘাতে নেতিয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোসা কাবার্কাসের জানা ছিল না, কার সঙ্গে লোকটা শুতে গিয়েছিল। কারণ ওই লোকটাও বিশেষভাবে ঢুকত ওই ফল বাগানের প্রবেশপথ দিয়ে। অংশত সন্দেহ করা যেতে পারে যে লোকটার সঙ্গে হয়তো আরও কোনো পুরুষ ছিল। বেশ্যালয়ের মালিক সর্দারনি আমার কাছে শুধু এটুকুই দাবি করল যে আমি যেন লাশটার গায়ে কাপড় পরাতে সাহায্য করি। রোসা এতটাই নির্বিকার ছিল যে আমার মনে এই শঙ্কা উঁকি দিল যে হয়তো তার কাছে মৃত্যুটা একটা সামান্য রান্নাঘরের ব্যাপারের শামিল। 'মৃত ব্যক্তিকে কাপড় পরানোর চেয়ে কঠিন আর কী হতে পারে', আমি বললাম। 'জীবনে একাধিকবার এ কাজ করেছি', তার জবাব, 'ব্যাপারটা খুবই সোজা, কেউ যদি একটু হাত দিয়ে লাশটাকে ধইরা রাখে।' আমি দেখিয়ে বললাম, 'ছুরির আঘাতে ফালি ফালি করে কাটা একটা লাশের গায়ে যে একেবারে ইংরেজ বাবুদের মতো কেতাদুরস্ত নিপাট পোশাক, এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে বলে তোমার মনে হয়?'

দেলগাদিনার জন্য আমি ভয়ে কাঁপলাম। 'সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি ওরে আপনার লগে লইয়া যান,' রোসা কাবার্কাস বলে। তার আগে মরণ যেন হয়, বললাম, 'আমার থুতু হিমশীতল।' সে ব্যাপারটা খেয়াল করল এবং তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'আপনি রীতিমতো কাঁপছেন।' ওর জন্য বললাম, 'আদতে কথাটা অর্ধেক সত্য। গোয়েন্দা পুলিশ কেউ আসার আগেই ওকে চলে যেতে বলো।' ঠিক আছে, ও বলল, যদিও আপনি তো রিপোর্টার, আপনার কোনো সমস্যা হইব না। 'তোমারও হবে না', একটু বিদ্বেষের সুরেই বললাম, 'তুমি তো এই সরকারের একমাত্র ক্ষমতাবান উদারপন্থী।'

ছিমছাম, নিরিবিলি স্বভাবের আজন্ম নিরাপদ শহরটির মানসম্মান আর থাকে না প্রতিবছরের এই জঘন্য, নৃশংস খুনের ঘটনায়। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। সরকারি তথ্য রিপোর্টে বলা হলো, বিশাল বড় কোনো হেডলাইনে নয়, বরং খুবই ছোট আকারে, যে তরুণ ব্যাংকারকে অজ্ঞাত কারণে প্রাদোমার মহাসড়কে ছুরির আঘাতে খুন করা হয়েছে তার কোনো শত্রু ছিল না। সরকারের তথ্যবার্তায় আরও বলা হয়েছে যে সম্ভাব্য খুনিরা দেশের অভ্যন্তরের অন্য এলাকার শরণার্থী যারা লাগাতার খুনের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে যেটা শহরের বাসিন্দাদের নাগরিক চেতনায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় ৫০-এর অধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই খবরে হকচকিত হয়ে আমি আইনবিষয়ক রিপোর্টারের শরণাপন্ন হলাম, বিশের দশকের মার্কা মারা এক সাংবাদিক। চোখে সবুজ শেড লাগিয়েছে আর হাতে ইলাস্টিকের ব্যান্ড পরে আগে থেকে ঘটনা আন্দাজ করে কী রকম একটা বাহাদুরি ফলাচ্ছে। কিন্তু আদতে খুনের মূল ঘটনার অল্পই সে জানে এবং আমি অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে যতটা পারি তাকে বললাম। এরপর দুজন চার হাতে প্রথম পৃষ্ঠার আট কলাম খবরের জন্য পাঁচ পৃষ্ঠা লিখে কপি করলাম, নির্ভরযোগ্য সূত্রের অক্ষয় অমর ভূতের বরাত দিলাম যার ওপর আমাদের অগাধ আস্থা। কিন্তু ওই জঘন্য অমানুষটা তার সেন্সরের কাঁচিযোগে সরকারি ভাষ্যটা জুড়ে দিতে একটুও কার্পণ্য করল না, যে খবরে বলা হচ্ছে আইনবিরোধী কাজে লিপ্ত এ রকম কিছু উদারপন্থীই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। শতাব্দীর সবচেয়ে নাক সিটকানো প্রচুর লোকের সমাগম হওয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশ করে গোমড়ামুখে হাজির হয়ে বিবেকের জ্বালাটাকে দূর করলাম।

সে রাতে বাড়ি ফিরে রোসা কাবার্কাসকে ফোন করলাম দেলগাদিনা ঠিকঠাক আছে কি না সেটা জানার জন্য, কিন্তু চার দিন ধরে সে কোনো ফোন ধরল না। পঞ্চম দিনে দাঁত খিঁচতে খিঁচতে গিয়ে আমি হাজির হলাম। দরজাগুলো সব সিল করা। কাজটা পুলিশের নয়, বরং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। এলাকার কেউ কিছুই জানে না। দেলগাদিনার কোনো হদিস না পেয়ে আমি হন্তদন্ত হয়ে খোঁজ লাগালাম, যা মাঝেমধ্যে হাস্যকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল এবং খুঁজতে খুঁজতে আমার জান যায় যায় অবস্থা। ধুলাবালুতে ভরা এক পার্কে যেখানে বাচ্চারা খেলতে খেলতে সিমোন বোলিবারের মূর্তিটার ওপর দিয়ে একবার ওঠে তো আরেকবার নামে, সেখানকার বেঞ্চিতে বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিলাম সাইকেলে চড়া অল্পবয়স্কা মেয়েদের খেয়াল করতে করতে। এত তাড়াতাড়ি তারা ছুটে যায় যেন হরিণ: সুন্দর, আয়ত্তগত, কানামাছি খেলায় এখনই ধরা পড়বে এমন। ওখানটায় ওভাবে বসে থেকে কোনো আশা আর না দেখে বোলেরো শুনে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু সেটাও ছিল প্রাণঘাতী: প্রতিটা শব্দেই দেলগাদিনা। আমি বরাবরই নিভৃতিতে বসে লিখেছি। কারণ, লেখার সময় গান বাজলে লেখার চেয়ে গানের দিকেই আমার মনোযোগ চলে যায়। এবার হলো তার উল্টো: বোলেরোর সুর ছাড়া আমি আর লিখতে পারছিলাম না। আমার জীবনের পরতে পরতে দেলগাদিনা। ওই দুই সপ্তাহে কলামের যে লেখাগুলো লিখলাম, সেগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল প্রেমপত্রের সাংকেতিক নমুনা। পাঠকদের চিঠির উত্তর দিতে দিতে অতিষ্ঠ হয়ে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আমাকে প্রেমের মাত্রাটা একটু কমিয়ে দেওয়ার কথা বলল, আমরা যখন অসংখ্য প্রেমাসক্ত পাঠকদের সান্ত্বনার একটা পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলাম।

অশান্ত মন নিয়ে আমার দিনগুলো আর আগের মতো রইল না। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে উঠেছি ঠিকই, কিন্তু অন্ধকার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি দেলগাদিনার কথা ভাবতে ভাবতে যে সে কী করছে তার অবাস্তব জীবনে: ভাইবোনদের ঘুম থেকে ওঠাচ্ছে, স্কুলের জন্য তৈরি করছে, কোনো খাবার থেকে থাকলে নাশতা দিচ্ছে এবং তারপর সাইকেলে চড়ে শহরের অন্য মাথায় গিয়ে বোতাম সেলাইয়ের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছে। আমি নিজেকে অবাক বিস্ময়ে শুধালাম: বোতাম লাগানোর সময় একটা মেয়ে কী নিয়ে চিন্তা করে? ও কি আমার কথা ভাবে? সেও কি রোসা কাবার্কাসকে খুঁজছে আমার খবর নেওয়ার জন্য? এক সপ্তাহ ধরে দিন-রাত আমি আমার মিস্ত্রি মার্কা কাপড়চোপড় পরেই থাকলাম, গোসল নেই, দাড়ি কামালাম না, এমনকি দাঁতও মাজলাম না। কেননা, অনেক দেরিতে হলেও প্রেমের কাছে দীক্ষা নিলাম যে গায়ে-গতরে সুন্দর থাকাটা আসলে বিশেষ কারও জন্য, সুন্দর কাপড়চোপড় পরা এবং সুগন্ধি মাখাটা আসলে অন্য কারও জন্য, আর আমার তো এ রকম কেউ কোনো দিন ছিল না। দিনের ১০টায় হ্যামক দোলনাটায় আমাকে ল্যাংটা শুয়ে থাকতে দেখে দামিয়ানা ভাবল যে আমার শরীর খারাপ। আমি তার দিকে কামনার মেঘে ঢাকা চোখে চাইলাম এবং তাকে পড়ে থাকা খড়ের গাদায় যাওয়ার ইঙ্গিত করলাম। সে কিছুটা রাগ মিশিয়ে বলল:

'আমি যদি হ্যাঁ বলি, তাহলে আপনি কী করবেন, সেটা কি ভেবে দেখেছেন?'

এভাবে বুঝলাম যে কষ্টে কষ্টে আমি কতটা নিচে নেমে গেছি। অল্পবয়স্ক বালক-তরুণদের মতো এই ব্যথাটা কোত্থেকে এল আমার ভেতর, বুঝলাম না। ঘর ছেড়ে মোটেই বাইরে বের হলাম না। পাছে না আবার ফোন আসে। ফোনটার তার লাগিয়ে লিখতে থাকলাম, ফোনটা বেজে উঠতেই দৌড়ে গিয়ে ধরছি, রোসা কাবার্কাসের ফোন ভেবে। ঘরের ভেতর যা কিছুই করছি না কেন, সেই কাজটা একটু থামিয়ে তাকে ফোন করছি, এভাবে ফোন করেই যেতে থাকলাম যতক্ষণ না এই বোধোদয় হলো যে ফোনটা হৃদয়হীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভীষণ বর্ষার এক বিকেলে ঘরে ফিরে দেখি, ঘরের দুয়ারের সিঁড়ির মুখে বিড়ালটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। নোংরা অবস্থা বিড়ালটার, বিধ্বস্ত এবং এতটা দুর্বল যে আমার দেখে মায়াই হলো। ম্যানুয়াল অনুসারে বিড়ালটা অসুস্থ, সে অনুযায়ী ম্যানুয়ালের নির্দেশিকা ধরে ধরে ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। তার পরই হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, আমি সিয়েস্তা নিচ্ছিলাম, এ রকম সময় কেন জানি আমার মাথায় এই ধারণা জন্মাল যে বিড়ালটা দেলগাদিনার বাসাটা চিনে চিনে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। একটা থলিতে ওটাকে ভরে রোসা কাবার্কাসের বেশ্যাখানায় নিয়ে গেলাম। এখনো সবকিছু সিল করা এবং কাকপক্ষীও নেই। কিন্তু বিড়ালটা থলির ভেতর এতটা মোচড়ামুচড়ি করছিল যে কোনোরকমে সে বেরিয়ে পালাল, ফলবাগানের দেয়ালের ওপর দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে গাছগাছালির ভেতর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দরজায় মুষ্টি দিয়ে দুমদুম আঘাত করলাম। দরজা না খুলেই ভেতর থেকে এক মিলিটারির আওয়াজ হুংকার ছাড়ে : কে ওখানে? এক বন্ধু, বললাম, টেক্কা মেরে। আমি মালিককে খুঁজছি। এই বেশ্যাখানার কোনো মালিক নেই, সেই কণ্ঠস্বরের আওয়াজ এল। অন্তত দরজাটা খোলেন, তা না হলে আমি আমার বিড়ালটাকে বের করতে পারছি না, গলায় জোর দিয়ে বললাম। না, এখানে কোনো বিড়াল নেই, উত্তর এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কে?

'কেউ না,' ওই কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ।

আমার সব সময়ই মনে হয়েছে যে প্রেমে পাগল হওয়াটা একটা মামুলি কাব্যময় ব্যাপার। সে বিকেলে, বিড়াল এবং ওকে ছাড়া সঙ্গীহীন অবস্থায় বাড়িতে একা, আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম যে এটা তো সম্ভবই, উপরন্ত আমার মতো একাকী এক বুড়োও প্রেমে দিশেহারা হয়। এটাও উপলব্ধি করলাম যে বিপরীতে সত্য বেরিয়ে আসে : জগতের কোনো কিছুর বিনিময়েই আমার ভালোবাসার কষ্টের আনন্দগুলো কাউকে দেব না আমি। পনেরো বছরেরও অধিক সময় ধরে লেওপার্দির গানগুলো অনুবাদ করার চেষ্টা করছিলাম এবং কেবল সেই বিকেলেই কী এক গভীরতায় কবিতাগুলো ধরা দিল আমার কাছে : *হায়, এ কী হাল আমার, এই যদি প্রেম হয়, তবে দেখো, কী কষ্ট আমার।*

আপাদমস্তক মুড়ে দাড়িটাড়ি না কামিয়ে পত্রিকা অফিসে যাওয়াতে আমার মানসিক অবস্থা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল কেউ কেউ। নতুন করে ঢেলে সাজানো অফিস, সূর্যালোকিত গ্লাস দেওয়া ছোট ছোট বসার কামরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে মনে হয় কোনো মাতৃসদন। কৃত্রিম পরিবেশ, সুনসান ও আরামদায়ক, অবস্থা এমন যে জোরে কথা বলতে কেমন যেন লাগে, তাই সবাই ফিসফিসিয়ে কথা বলে আর পা টিপে টিপে চলে। লবিতে, মৃত বড়লাটদের মতো আজীবন সম্পাদক তিনজন আর গণ্যমান্য যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে অফিস প্রদর্শনে এসেছেন, তাঁদের ছবি ঝুলছে। মস্তবড় প্রধান কক্ষটার দেয়ালে বিশাল জায়গাজুড়ে ঝুলছে, আমার জন্মদিনের দিন বিকেলে তোলা বর্তমান সম্পাদকীয় বিভাগের স্টাফদের ছবিটা। মনে মনে আমার বয়স যখন ত্রিশ, তখন তোলা ছবিটার সঙ্গে বর্তমান এ ছবিটার তুলনা না করে পারলাম না এবং আবারও ভয়ে আশ্বস্ত হলাম যে একজন মানুষকে ছবিতে যতটা না বয়স্ক লাগে, তীব্রতাসহ বাস্তবে কিন্তু ততটা লাগে না। যে মহিলা সেক্রেটারি আমার জন্মদিনের দিন বিকেলে আমার গালে চুমু দিয়েছিল, জিজ্ঞেস করল, আমি অসুস্থ কি না। আমি বেশ খুশিমনে তাকে সত্য জবাবটা দিলাম, সে যে বিশ্বাস করবে না সেটা জেনেই : প্রেমের অসুখে ভুগছি। সে বলল : ইশ্, আমার প্রেমে তো পড়লেন না। আমি সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গিতে পাল্টা বললাম : বলা যায় না।

আইনবিষয়ক রিপোর্টারটি তাঁর ছোট্ট কক্ষ থেকে উঁচু গলায় এ কথা বলতে বলতে বের হলেন যে শহরের স্বর্গে দুটি অজ্ঞাত পরিচয় মেয়ের লাশ পড়ে আছে। ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কী বয়সী? 'তরুণী', সে বলল, 'সরকারি লুটেরাদের তাড়া খেয়ে বেড়ানো দেশের অভ্যন্তরভাগের কোনো অঞ্চলের শরণার্থী হবে হয়তো।' আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। 'গুটি গুটি করে নীরবে অবস্থাটা তো আমাদের ঘিরে ফেলছে, রক্তের ছোপের মতো,' আমি বললাম। আইনবিষয়ক রিপোর্টারটা কিছুটা দূর থেকে গলা চেঁচিয়ে বলল,

'রক্ত না, মায়েস্ত্রো, গু।'

দিন কয়েক পর আমার অবস্থা আরও বেহাল হলো, ওয়ার্ল্ড বুকস্টোরের সামনে দিয়ে যখন ঝট করে অতি দ্রুত বেগে একটা মেয়ে হেঁটে গেল, বিড়ালের ঝুড়িটার মতো একটা ঝুড়ি হাতে। মেয়েটির পিছু নিলাম, ভরদুপুরে কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। মেয়েটি বেজায় সুন্দরী, এমন নমনীয় ভঙ্গিতে পথ দেখে দেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল যে আমার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল ওর সঙ্গে তাল মেলাতে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম এবং তার মুখের দিকে তাকালাম। সে এক হাত দিয়ে এক পাশে আমাকে সরিয়ে দিল, না থেমেই এবং কোনো রকম সরিটরি না বলে। আমি যার কথা ভেবেছিলাম, মেয়েটি আসলে সে নয়, কিন্তু মেয়ের ঔদ্ধত্য আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনভাবে কাবু করল যে মনে হলো সেই জনা। এ ঘটনায় আমার বোধগম্য হলো যে কাপড়চোপড় পরা জাগ্রত অবস্থায় দেলগাদিনাকে দেখে আমি চিনতে পারব না, আর সেও আমাকে চিনতে পারবে না, যদি না কোনো দিন সে আমাকে দেখে থাকে। উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় তিন দিনে আমি মোট ১২ জোড়া নীল ও গোলাপিরঙা বাচ্চাদের বুট বুনলাম, মনে মনে নিজেকে এই সাহসের জোগান দিতে দিতে যে গান শুনব না, গাইব না, গান নিয়ে ভাববও না, যে গান আমাকে ওর কথা মনে করিয়ে দেয়।

সত্যি বলতে কি, আমার হৃদয়টাকে আয়ত্তে আনতে পারিনি এবং আমি ক্রমেই বার্ধক্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলাম ভালোবাসার কাছে কাবু হয়ে। ব্যাপারটার আরও একটা নাটকীয় প্রমাণ মিলল, যখন একটা পাবলিক বাস চলন্ত অবস্থায় সাইকেল চালানো একটা মেয়েকে চাপা দিয়ে গেল বাণিজ্যিক এলাকার কেন্দ্রে। মেয়েটিকে এইমাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মাত্রা বোঝা যায় সাইকেলটাকে দেখলে, উজ্জ্বল লাল ছোপ ছোপ ছড়িয়ে থাকা রক্তের মধ্যে সাইকেলটা দুমড়েমুচড়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু সাইকেলের দুরবস্থায় আমি যতটা না বিচলিত, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হতে লাগল সাইকেলের ব্র্যান্ড, মডেল আর রং দেখে। আরে, এটাই তো বোধ হয় দেলগাদিনাকে কিনে দিয়েছিলাম।

ঘটনার সাক্ষীর বরাত অনুযায়ী ও আহত সাইকেলচালক মেয়েটি বেশ কম বয়সী। লম্বা ও পাতলা গড়ন, ছোট করে ছাঁটা চুল। হতভম্ব হয়ে চোখে প্রথম যে ট্যাক্সিটা পড়ল, সেটাকে থামিয়ে ওটাতে করে কারিদাদ হাসপাতালে গেলাম, এলামাটির রঙের দেয়ালের পুরোনো ভবনটাকে দেখলে মনে হয়, চোরাবালুতে আটকে পড়া একটা কয়েদখানা। সুগন্ধি ফলগাছে ভরপুর এক উঠোনে ঢুকতে আর বের হতে আধঘণ্টা আধঘণ্টা প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল, যে উঠোনে বিপর্যস্ত এক মহিলা আমার পথ রোধ করল, আমার চোখের দিকে চাইল এবং হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠল :

'আমি সে নই, যাকে তুমি খুঁজছ।'

ঠিক তখন আমার মনে পড়ল যে এই হাসপাতালে তো পৌর মানসিক চিকিৎসালয়ের যেসব রোগী মারধর করে না, তাদের অবাধে থাকতে দেওয়া হয়। হাসপাতালের পরিচালনা কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের সাংবাদিক পরিচয়টা দেওয়ার পরই একজন নার্স আমাকে জরুরি ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। রোগী ভর্তির খাতায় নামধাম লেখা আছে : রোসালবা রিওস, ১৬, বলার মতো কিছু করে না। ডায়াগনসিস : মস্তিষ্কে প্রচণ্ড আঘাত। প্রগ্‌নসিস :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবজার্ভেশন। ওয়ার্ডের প্রধানকে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটিকে একটু দেখা যাবে কি না, মনে মনে ভাবলাম যে তিনি না করবেন, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটির কাছে, তাঁরা এই ভেবে বেশ প্রীত হলেন যে আমি হয়তো হাসপাতালের এই দুরবস্থা নিয়ে কিছু একটা লিখব।

হাবিজাবি জিনিসে ভর্তি একটা ওয়ার্ড পার হলাম আমরা, যে ওয়ার্ড থেকে কার্বোলিক অ্যাসিডের কড়া গন্ধ বের হচ্ছিল, আর রোগীরা সব বিছানার কাছে জড়ো হয়ে আছে। একেবারে শেষ মাথায়, একটা সিঙ্গেল রুমে, মেটাল খাটে শুয়েছিল মেয়েটি, যাকে আমরা খুঁজছি। পুরো মাথায় ব্যান্ডেজ, মুখ দেখে চেনার কোনো উপায় নেই, গাল অস্বাভাবিক ফোলা এবং কালচে নীল, কিন্তু আমার দরকার ছিল শুধু একনজর মেয়েটির পা দেখা, এটা জানার জন্য যে সে দেলগাদিনা নয় এবং ঠিক তখনই আমার মনে এই ভাবনা এল : যদি দেলগাদিনাই হয়, তবে আমি কী করব?

রাতের সূক্ষ্ম ফাঁদে ভিরমি খেতে খেতে পরের দিন বুকে সাহস সঞ্চার করে সেই শার্টের ফ্যাক্টরিতে গেলাম, যেটার কথা রোসা কাবার্কাস আমাকে একবার বলেছিল যে মেয়েটি ওখানে কাজ করে, আর মালিককে বললাম, তার ফ্যাক্টরিটা জাতিসংঘের মহাদেশব্যাপী প্রোজেক্টের মডেল হিসেবে দেখতে চাই। লোকটা ছিল হস্তীকায় গম্ভীর প্রকৃতির এক লেবাননি, যে তার সাম্রাজ্যের দরজা খুলে দিল আমাদের জন্য পৃথিবীর কাছে দৃষ্টান্ত রাখার কাল্পনিক আশা নিয়ে।

সাদা জামা পরা আর কপালে অ্যাশ ওয়েডনেসডের ক্রশ আঁকা ৩০০ মেয়েশ্রমিক বিশাল আলো দেওয়া জাহাজ আকৃতির অংশে বোতাম সেলাই করছিল। আমাদের আসতে দেখে তারা সোজা উঠে দাঁড়ায়, স্কুল বালিকাদের মতো এবং কোনা চোখে দেখতে থাকে, আর ওদের ম্যানেজার আবহমান কাল থেকে চলে আসা বোতাম লাগানোর এই শিল্পকলায় তার অবদানের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করছিল। আমি প্রত্যেকের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম, ভয়ে ভয়ে যে এই বুঝি কাপড়চোপড় পরা জাগ্রত দেলগাদিনাকে আবিষ্কার করব। বরং উল্টো ওদেরই মধ্যে থেকে একজন আমাকে আবিষ্কার করল, নিষ্করুণ মুগ্ধতার এক ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে :

'সেনঞর, আপনিই তো সেই জন, যিনি পত্রিকায় প্রেমপত্র লেখেন, না?' আমি জীবনে কল্পনাও করিনি যে একটা ঘুমন্ত মেয়ে আমাকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে। কোনো রকম বিদায় না জানিয়েই, এমনকি যন্ত্রণাক্লিষ্ট এই কুমারীদেরই মধ্যে মিলে যাবে সেই জনা, যাকে আমি খুঁজছিলাম, সেই চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতিরেকেই ওই ফ্যাক্টরি থেকে আমি পালালাম। বাইরে যখন বেরিয়ে এলাম, জীবনে যে জিনিসটা বাকি রইল শুধু, সেটা হলো কাঁদা।

এক মাস পর রোসা কাবার্কাস ফোন করে এক অবিশ্বাস্য ব্যাখ্যা জুড়ল : ওই ব্যাংকারের হত্যার পর, কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসে সে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে। রোসার এই কথা বিশ্বাস করার কোনো মানেই হয় না, কিন্তু তবু আমি তাকে তার এই ভাগ্যলক্ষ্মীর ফেরে অভিনন্দন জানালাম এবং তার মিথ্যাটা সবিস্তারে বলার সুযোগ দিলাম এবং অবশেষে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে প্রশ্নটা আমার ভেতর টগবগ করে ফুটছিল :

'মেয়েটির কী খবর?'

রোসা কাবার্কাস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। 'আছে,' অবশেষে বলল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা পাশ কাটানো ভাব : 'আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।' 'কত দিন?' 'ঠিক জানি না, আপনারে জানামু। 'আমার মনে হলো, সে আমার কাছ থেকে ভাগতে চাইছে, তাই তাকে থামালাম ঠান্ডাভাবে : 'দাঁড়াও, একটু আশার কথা শুনিয়ে যাও।' 'আশার কিছু নেই,' সে বলল এবং এই কথা বলে শেষ করল : 'সাবধান, আপনার নিজের ক্ষতি হইতে পারে আর সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটিরও ক্ষতি হইতে পারে।' তার এজাতীয় নেকি কথাবার্তা শোনার কোনো আগ্রহ ছিল না আমার। সত্যটা বের করার একটা সুযোগ নেওয়ার জন্য অনুনয় করলাম একটু। বললাম, 'দিনের শেষে আমরা তো একে অপরের সহচর।' সে আর কথা অন্যদিকে বাড়াল না। 'শান্ত হন,' সে বলল, 'মাইয়াটা ঠিকঠাক আছে এবং আমার ডাকের অপেক্ষায় আছে, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কিছু করার নেই, আর আমি আর কিছু কমু না। আদিওস্।'

টেলিফোনটা হাতে নিয়ে বসে রইলাম আমি, বুঝলাম না এরপর কী করা উচিত, আর রোসা কাবার্কাসকেও যতটুকু চিনি, তাতে সে যদি নিজে থেকে কিছু না দেয়, তাহলে ওর কাছ থেকে কিছু পাব না। পরে সেদিন বিকেলে আমি চোরের মতো তার ডেরায় গেলাম, যুক্তির চেয়েও কপালের ওপর আস্থা রেখে এবং দেখলাম দরজা-জানালা সব বন্ধ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সিল করা। আমি ভাবলাম, রোসা কাবার্কাস তাহলে আমাকে অন্য জায়গা থেকে ফোন করেছে, হয়তো অন্য কোনো শহর থেকে এবং এটুকু ভেবেই আমি মনে মনে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যা ছয়টায়, আমি মোটেই ভাবছিলাম না এসব, টেলিফোনে সে আমার মনে মনে ভাবা কথাটা উচ্চারণ করল :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে, আজকে আসেন।'

সেদিন রাত ১০টায়, কাঁপতে কাঁপতে আর ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে না আবার কেঁদে ফেলি এই আশঙ্কায়, কয়েক বাক্স সুইস চকলেট, বাদামের ক্যান্ডি ও ক্যারামেল এবং বিছানা পাতার জন্য এক ঝুড়ি আগুন লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হলাম। দরজাটা আধা খোলা ছিল, রুমের বাতি জ্বালানো, আর রেডিওতে মাঝারি আওয়াজে লঘু স্বরে বাজছিল ভায়োলিন ও পিয়ানোতে ব্রাহ্মের প্রথম সোনাটা। বিছানায়, দেলগাদিনাকে এতটা আনন্দিত আর আলাদা লাগছিল যে আমার বেশ কষ্ট হলো ওকে চিনতে।

ও একটু বেড়ে উঠেছে, ঠিক দেখতে-শুনতে নয়, বরং এক প্রগাঢ় আবেগতাড়িত পূর্ণতায়, যার কারণে দেখলে মনে হয়, ওর বয়স আরও দুই কি তিন বছর বেড়ে গেছে। এবং শরীর আরও খুলে গেছে। ওর উঁচু চোয়াল, দুর্গম সাগরের রোদে পোড়া তামাটে ত্বক, নরম কোমল ঠোঁট এবং ওর ছোট কোঁকড়া চুল ওর মুখকে প্রাক্সিতেলেসের *অ্যাপোলোর* উভলিঙ্গ লক্ষণযুক্ত জেল্লায় রঞ্জিত করেছে। দুমুখো কথা বলার সুযোগ নেই, তার স্তনগুলো বেড়ে এমন হয়েছে যে আমার হাতে আটে না, তার নিতম্ব সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর তার হাড়গুলো আগের চেয়ে আরও দৃঢ় এবং ছন্দময়। প্রকৃতির এই খেয়ালে আমি মুগ্ধ হলাম, কিন্তু মেকআপের চতুরতায় স্তম্ভিত হলাম: নকল আইল্যাশ, হাত ও পায়ের নখে মুক্তা পলিশ, আর সস্তা একটা সুগন্ধি, যেটার সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। তার পরও যেটা দেখে আমার চোখ স্থির হয়ে গেল, সেটা হলো যেসব দামি মণিপাথর সে পরেছিল: পান্না বসানো সোনার কানের দুল, প্রকৃতিদত্ত মুক্তার একটা গলার হার, চিকচিক করা হীরা বসানো একটা সোনার বালা এবং হাতের প্রতিটি আঙুলে আসল পাথরের আংটি। চেয়ারের ওপর পড়ে আছে ওর চুমকি বসানো এমব্রয়ডারির সন্ধ্যাকালীন পোশাক ও শাটিনের হালকা চটি। আমার খুব ভেতর থেকে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

'বেশ্যা!' আমি চিৎকার দিলাম।

আমার কানে শয়তান এই কুটিল চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অশুভ ভাবনাটা এ রকম: দুর্ঘটনার দিন রাতে, রোসা কাবার্কাসের সময় বা হুঁশ কোনোটাই ছিল না মেয়েটিকে সতর্ক করে দেওয়ার এবং পুলিশ মেয়েটিকে পেল তার রুমে, একাকী, অল্পবয়স্ক, কোনো রকম অছিলা ছাড়া। রোসা কাবার্কাসের নাজুক এই পরিস্থিতি দেখতে কারোরই ভালো লাগার কথা নয়, কুমারী মেয়েটিকে বিক্রি করে দিল সে তার এক ক্ষমতাবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাটসাহেবের কাছে অপরাধের যাবতীয় সাজা থেকে মওকুফের বিনিময়ে। অবশ্যই প্রথমে যেটা করণীয় ছিল, সেটা হলো কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দেওয়া, যত দিন না কেলেঙ্কারিটা নিয়ে মাতামাতি শেষ হচ্ছে। কী চমৎকার! তিনজনের মধুচন্দ্রিমা, দুজন বিছানায় একসঙ্গে, আর রোসা কাবার্কাস বিলাসবহুল এক চাতালে বসে হাসিমুখে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। বেহুঁশের মতো রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে, রুমের সব জিনিস দেয়ালে আছড়ে ভেঙে ফেলতে লাগলাম: ল্যাম্প, রেডিও, ফ্যান, আয়না, বড় জগ, গ্লাস। কোনো রকম তাড়াহুড়া না করেই করছিলাম ব্যাপারটা, কিন্তু একেবারে না থেমেই, দুমদাম শব্দ করতে করতে একটা নিয়মানুগ ক্ষিপ্রতায়, যা আমার জীবন বাঁচাল। প্রচণ্ড শব্দের প্রথম ধাক্কায় মেয়েটি একটু নড়েচড়ে উঠল, কিন্তু আমার দিকে তাকাল না; বরং সে পেছন ফিরে থাকল এবং সেভাবেই থাকল, থেমে থেমে ধমকে উঠছিল, যতক্ষণ না ভাঙাভাঙি চলল। উঠোনের মুরগি আর শেষ রাতের কুকুরগুলো এই গোলমালের আওয়াজে আরও কিছু যোগ করল। ক্রোধের উদ্দেশ্যহীন স্বচ্ছতা নিয়ে শেষমেশ বেশ্যালয়ে আগুন লাগানোর জন্য আমি তৈরি হয়েছি, ঠিক তখন রোসা কাবার্কাসের অবিচল মূর্তি, নাইট গাউন পরা, দরজায় এসে দাঁড়ায়। সে কিছু বলল না। চোখ বুলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির একটা হিসাব করল এবং নিশ্চিতভাবে বলল যে মেয়েটি কুঁকড়ে একেবারে শামুকের মতো গুটিয়ে গেছে, দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজে: আতঙ্কিত কিন্তু অক্ষত।

'হায় ঈশ্বর!' রোসা কাবার্কাস চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ রকম একটা প্রেমের জন্য আমি কী-ই না করতাম!'

করুণার চোখে আমাকে আপাদমস্তক দেখল সে এবং নির্দেশ দিল: 'চলেন যাই।' আমি তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকলাম, সে আওয়াজ না করে আমাকে এক গ্লাস পানি ঢেলে দিল, ইশারায় আমাকে তার উল্টো পাশে বসতে বলল এবং আমার কবুল করা কাহিনিটা শোনার প্রস্তুতি নেয়। ঠিক আছে। সে বলে, 'এবার একটু বড়গো মতো চিন্তা কইরা কন তো, আপনার কী হইছে।'

আমার সত্যটাকে খুলে ধরে তাকে সবিস্তারে সব বললাম। রোসা কাবার্কাস নীরবে আমার কথা শুনল, একটুও অবাক না হয়ে এবং সব শুনেটুনে সে খুব মজা পেল মনে হলো। 'কী চমৎকার!' সে বলল। আমি সব সময় বলে আসছি যে সত্যের চেয়েও হিংসা জানে বেশি। এরপর কোনো কিছু চাপা না রেখেই সে আমাকে বাস্তব ঘটনাটা বলল। আসলে, সে বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুনের ঘটনার রাতে বিভ্রান্তির মধ্যে সে ভুলেই গেছিল, ওই রুমে ঘুমিয়ে থাকা মেয়েটির কথা। তার এক খদ্দের, যে আবার কিনা খুন হওয়া লোকটার উকিল ছিল, দুই হাতে প্রচুর টাকা খরচ করল এবং ঘুষসহ এটা-ওটা করে দিয়ে রোসা কাবার্কাসকে আমন্ত্রণ জানাল, কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াসের একটা চুপচাপ হোটেলে গিয়ে থাকার জন্য, যত দিন না স্ক্যান্ডালটা থেমে যায়। 'বিশ্বাস করেন,' বলল রোসা কাবার্কাস, 'এই সময়টায় আমি আপনার এবং মাইয়াটার কথা ভাবছি বহুত। গত পরশু ফিরা আইস্যা প্রথমেই আপনারে ফোন করছি, কিন্তু কেউ ফোনটা ধরেনি। আর এদিকে হইছে কি, মাইয়াটা খবর দেওয়ার লগে লগে আইয়্যা পড়ছে, ওর অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে আপনার লাইগ্যা ওরে গোসল করাইছি, কাপড় পরাইছি, হেয়ার ড্রেসারের কাছে পাঠাইছি এবং ওগোরে কইয়্যা দিছি, যাতে ওরে রানির মতো সাজাইয়্যা দেয়। আপনি তো দেখছেনই, ওরে কেমন লাগতাছে : কোনো খুঁত নেই। আর ওর দামি পোশাক? খদ্দেরগো লগে নাচবার সময় পরবার লাইগা আমার এখানকার গরিব মাইয়াগুলোরে যে কাপড় ভাড়া দিই, হেগুলিরই একটা। আর গয়নাগাটি? ওগুলি আমার, সে বলে : আপনি হাত দিয়ে ধরলেই দেখবেন যে পাথরগুলো হইল কাচ আর যেগুলোরে মনে হয় দামি মণি-পাথর, হেসব হইল টিন। তো ঈশ্বরের দোহাই ওলটপালট কাজ কইরেন না,' সে বলা শেষ করে : 'যান, ওকে ঘুম থেকে জাগাইয়া তুলেন, মাফ চান এবং ওরে এখন থেকে সারা জীবনের জন্য নিজের কইর‍্যা লন। আপনাগো দুজনের চাইতে বেশি খুশি হইবার হক নাই কারও।'

অতিমানবিক একটা চেষ্টায় তাকে বিশ্বাস করতে হলো, যদিও প্রেম কোনো কারণের ধার ধারে না। 'বেশ্যা!' আমি বললাম, 'আমার পেটের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের দহন। তোমরা আর কিছু না!' আমি চেঁচালাম : 'যত সব বেশ্যা, খানকি! তোমার সম্পর্কে আর কিছু জানার কোনো আগ্রহই নেই আমার, এই পৃথিবীর আর কোনো মাগি সম্পর্কেও কিছু জানতে চাই না, আর ওর কথা তো বাদই দিলাম।' দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়লাম : বিদায় চিরদিনের। রোসা কাবার্কাস মোটেই সন্দিগ্ধ হলো না।

'ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকুন, সে বলল, আক্ষেপে মুখ বিকৃত করে এবং এ কথা বলে সে তার বাস্তবে ফিরে গেল, 'যা-ই হোক, আমার এই রুমটা লন্ডভন্ড করার জন্য হিসাব করে বিলটা আপনারে পাঠাইয়া দিমু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ

থর্নটন ওয়াইল্ডারের উপন্যাস *ইদ্‌স্ অব মার্চ* পড়তে পড়তে চোখ আটকে গেল একটা ভীতিকর বাক্যে, যেটা লেখকের মতে জুলিয়াস সিজারের উক্তি: *অন্যরা তোমার সম্পর্কে যা ভাবে, সেটা না হয়ে শেষ পর্যন্ত বাঁচার কোনো উপায় নেই*। এটা জুলিয়াস সিজারের লেখায় সত্যি সত্যি আছে কি না, নাকি সুটোনিয়াস থেকে শুরু করে কার্কোপিনাস পর্যন্ত তাঁর জীবনীকারদের মধ্যকার কারও লেখা, সেটা হলপ করে বলতে পারলাম না, কিন্তু জানতে পারলে বেশ ভালো হতো। উক্তিটির ভবিতব্য, পরবর্তী কয়েক মাসে আমার জীবনের গতিধারায় যা অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়, আমার ভেতর এই দৃঢ়সংকল্প এনে দিল, যেটা এই স্মৃতিকথাগুলো লেখার জন্যই শুধু যে তা নয়, উপরন্তু কোনো রকম সংকোচ ছাড়াই যেন ওগুলো শুরু করা যায়, দেলগাদিনার ভালোবাসা নিয়ে, তার জন্যও দরকার ছিল।

অশান্তিতে দিন পার হতে লাগল, খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিলাম, আর আমার ওজন এতটাই কমে গেল যে আমার কোমরের কাছে প্যান্ট ঝুলে থাকে। হাড়গোড়ে উদ্ভট কিসিমের ব্যথা হতে লাগল, কথা নেই বার্তা নেই মেজাজ বিগড়ে যেতে লাগল, রাতের পর রাত এমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটাতে লাগলাম যে বই পড়া বা গান শোনা কোনোটাই হলো না, আর দিনের বেলা এক তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটল, কিন্তু ঘুম আর আসে না।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি মিলল অপ্রত্যাশিতভাবে। লোমা ফ্রেসকা গোন্ডোলার ভিড়ভাট্টায়, আমার পাশে বসা এক মহিলা, যাকে আমি বাসে উঠতে দেখিনি, সে আমার কানে ফিসিফিসিয়ে বলল, এখনো মেয়েদের সঙ্গে শুয়ে বেড়াও? মহিলাটি ছিল কাসিলদা আর্মেন্তা, পুরোনো দিনের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ্যা, যাকে যখনই ডেকেছি, তখনই আমার সঙ্গে ভাড়ায় গিয়েছে, তার কী উদ্ধত যৌবন তখন। এ লাইনে কাজ যখন ছেড়ে দিল, অসুস্থ অবস্থায় আরেকটাও কানাকড়ি ছিল না, বিয়ে করল এক চীনা সবজি ব্যবসায়ীকে, যে তাকে শুধু তার নামই দিল না, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতাও করল এবং হয়তো একটু-আধটু ভালোবাসাও ছিল। তিয়াত্তর বছর বয়সেও তার ওজন একই রইল, যা সব সময় ছিল, তখনো যথেষ্ট সুন্দরী, শক্ত মনোবল, তার কাজের লাইনের স্বভাবসুলভ উদ্ধত কথাবার্তা তখনো যায়নি।

সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল, সমুদ্রের দিকে যাওয়ার মহাসড়ক ঘেঁষে দাঁড়ানো পাহাড়ের ওপর চীনা শ্রমিকদের এক খামারবাড়ি। ছায়াঢাকা ছাদে সৈকতে যে রকম থাকে, সে রকম আরাম করে বসার চেয়ারে বসলাম আমরা। আলস্ট্রোমেরিয়াস পাতাবাহার আর ফার্নে ঢাকা চারপাশ, আর ছাদের বেরিয়ে থাকা অংশে ঝুলছে পাখির খাঁচা। পাহাড়ের পাশে দেখা যায় মোচাকৃতির টুপি মাথায় চীনা কৃষকেরা কাঠফাটা রোদে শাকসবজির চারা লাগাচ্ছেন আর চোখে পড়ে পাথর দিয়ে বাঁধানো দুই পরিখাসহ বোকাস দে সেনিসার ধূসর জল। পরিখাগুলো দিয়ে নদীর পানি পথ করে নিয়ে সাগরের মধ্য দিয়ে বহুদূর অবধি গেছে। আমাদের কথাবার্তা চলাকালে দেখলাম, একটা সাদা সমুদ্রজাহাজ বহির্গমনপথে প্রবেশ করল এবং কোনো কথা না বলে ওটাকে অনুসরণ করলাম চোখে চোখে, যতক্ষণ না নদীবন্দর থেকে আমাদের কানে এল ওটার বিষণ্ণ ষাঁড়ের ডাকের মতো গর্জন। সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল: 'একটা ব্যাপার কি তুমি জানো? এই অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ে এবারই প্রথম আমি তোমার সঙ্গে বিছানায় গেলাম না।' 'সেদিনের সেই আমরা কি আর এক আছি,' আমি বললাম। সে বলেই চলল আমার কথায় কর্ণপাত না করে: 'যখনই তোমাকে নিয়ে এটা-ওটা ওরা বলে রেডিওতে, তোমার প্রশংসা শুনি, তোমার প্রতি মানুষের ভালোবাসার টানের কথা শুনি, তোমাকে প্রেমগুরু বলে ডাকে, একটু ভেবে দেখো, আমার মতো করে তোমার বাতিকগুলো আর তোমার ভাবসাব আর কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না। ভেবেচিন্তেই বলছি কথাটা', সে বলল, 'আমার মতো করে তোমাকে কে-ই বা অতটা আদর-যত্ন করতে পারে।'

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। সে বুঝল ব্যাপারটা, আমার চোখ পানিতে ভিজে উঠতে দেখল এবং তখন তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি আর সেই মানুষটি নেই, আর তার ওই অমন করে তাকানো হজম করার সাহস যে আমার ছিল, সেটা কখনো ভাবিনি। 'সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে কি, আমার বয়স হচ্ছে,' আমি বললাম। 'আমরা তো বুড়োই,' সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ব্যাপারটা হলো, তুমি ভেতর থেকে ওটা বুঝবে না, কিন্তু বাইরে থেকে ব্যাপারটা তো স্পষ্ট।'

আমার হৃদয়ের কাহন ওকে না শুনিয়ে উপায় ছিল না, তাই ওকে পুরা কাহিনিটা বললাম, ভেতরে ভেতরে জ্বলতে জ্বলতে, আমার মর্মান্তিক রাতের কাহিনি পর্যন্ত, যে রাতে আমি ওই রকম সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলেছিলাম এবং সেই যে বেরিয়ে এসেছি আর যাওয়া হয়নি। আমার হৃদয় নিংড়ানো কাহিনিটা সে এমনভাবে শুনল যে মনে হয় এটা তারই কাহিনি, ভাবল মন দিয়ে এবং সব শুনে হাসল।

'আর যা-ই করো, ওই বাচ্চা মেয়েটিকে হারিয়ো না,' সে বলল, 'একা একা মরার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই নেই।'

ঘোড়ার বেগে চলা ছোট্ট টয় ট্রেনটায় চেপে আমরা পুয়ের্তো কলম্বিয়ায় গেলাম। দুপুরের আহার সারলাম পোকায় খাওয়া কাঠের ডেকের অন্য পাশে, বোকাস দে সেনিসা নদী ড্রেজিং করার আগে, যেখান দিয়ে একসময় সবাই দেশে ঢুকত। তালগাছের ছাউনির নিচে গিয়ে আমরা বসলাম, সেখানটায় বিশালদেহী কালো মেট্রনরা কোকোনাট বাইসের সঙ্গে রেড স্ন্যাপার ভাজা আর সবুজ কলার চিপসের টুকরো পরিবেশন করছে। বেলা দুইটার প্রচণ্ড অবশ করা রোদে আমরা ঝিমাতে লাগলাম এবং কথা চলল আমাদের। বাস্তবতাকে চমৎকার লাগল আমার। 'দেখো, আমাদের মধুচন্দ্রিমা কোথায় গিয়ে শেষ হলো,' সে ঠাট্টা করল। কিন্তু তারপরই সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল : 'আজকে পেছন ফিরে দেখলে, দেখি হাজারো পুরুষের লাইন আমার বিছানা অভিমুখে, আর ভাবি যে ওদের মধ্যে একেবারে নিকৃষ্টটার সঙ্গে থাকার জন্য হলেও আমি মরিয়া হয়ে পড়তাম। ঈশ্বরের অনেক কৃপা যে আমার চীনা বরকে ঠিক সময়মতো খুঁজে পেয়েছিলাম। ওর সঙ্গে ব্যাপারটা ছিল তোমার কড়ে আঙুলটাকে বিয়ে করার মতো, কিন্তু ও আমারই।'

সে আমার চোখের দিকে চাইল, সে এইমাত্র আমাকে যা বলল সেটা আমার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া করে সেটা একটু মাপল আর বলল : 'যাও, গিয়ে সেই বেচারিকে খুঁজে বের করো। এমনকি হিংসায় যা ভাবছ, সেটা যতই সত্য হোক না কেন, আর যা-ই ঘটুক না কেন, তোমার কাছ থেকে তাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না; কিন্তু দাদা-মার্কা কোনো রোমান্টিকতা নয়। যাও, মেয়েটিকে ঘুম থেকে ওঠাও, তারপর শরীর দিয়ে জাপটে ধরে ওকে দুমড়েমুচড়ে ফেলো, কাপুরুষতা আর কিপ্টেমির উপহারস্বরূপ। আমি কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে সত্যি সত্যিই জোর দিয়ে বলছি, 'সে শেষ করে অন্তর দিয়ে বলা কথাটুকু : 'ভালো যদি বেসেই থাকো, তবে ভালোবাসার মানুষটার সঙ্গে মিলনে যে কী আনন্দ সেটা না জেনে মরে যেয়ো না।

পরের দিন ওই নম্বরে ফোন করার সময় আমার হাতটা কেঁপে উঠল। দেলগাদিনার সঙ্গে অনেক দিন পর আবার দেখা হবে—এই চিন্তায় ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমাকে যে উল্টাপাল্টা বিল ধরিয়ে দিচ্ছিল, সেটা নিয়ে তো তার সঙ্গে হুলস্থূল ঝগড়া হয়েছিল। আমার মায়ের খুবই পছন্দের একটা পেইন্টিং বিক্রি করতে হয়েছিল আমাকে, খুবই দামি, কিন্তু দরকারের সময় বিক্রি করে যেটা মিলল, সেটা যা আশা করেছিলাম তার দশ ভাগেরও এক ভাগও নয়। আমার যৎসামান্য বাকি সঞ্চয়টাও যোগ করলাম এবং টাকাটা রোসা কাবার্কাসের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, আর কোনো কথা শুনতে চাই না; নাও আর না হয় কেটে পড়ো। ব্যাপারটা আত্মঘাতী হয়ে গেল, ও যদি একটু মুখ খুলে আমার গোপন কাহিনির একটুও ফাঁস করে দেয়, তাহলে কিন্তু আমার সুনাম সব ভেস্তে যাবে। সে কোনো কথা বাড়াল না, কিন্তু পেইন্টিংগুলো রেখে দিয়েছিল আমাদের যে রাতে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল, তখন জামানত হিসেবে। একটা খুদে নাটকে একেবারে ভেঙে গেলাম : দেলগাদিনাকে ছাড়া একা হয়ে গেলাম, রোসা কাবার্কাসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রইল না এবং কানাকড়িও সঞ্চয় রইল না আর। সে যা-ই হোক, আমি ফোনের রিং পড়ার আওয়াজ শুনলাম একবার, দুবার, তিনবার এবং অবশেষে রোসা কাবার্কাসের কণ্ঠ : হ্যাঁ? আমার গলায় কোনো আওয়াজ বেরোল না। ফোনটা রেখে দিলাম। হ্যামকে শুয়ে থাকলাম, এরিক সাতিয়ের ধ্যানী গীতিধর্মিতায় মনের প্রশান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় এবং আমি এতটাই ঘামলাম যে ক্যানভাসটা ঘামে ভিজে জবজবে অবস্থা। পরের দিনের আগে আর সাহস হলো না ফোনটা করার।

'ঠিক আছে, লেডি,' বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললাম, 'আজই।'

রোসা কাবার্কাস, অবশ্যম্ভাবীভাবে খুবই স্বাভাবিক আচরণ করল। 'হায় রে আমার দুঃখী পণ্ডিত এবং সে তার অজেয় মনোভাব নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুই মাসের জন্য উধাও হইয়া গেলেন এবং তারপর ফিরা আইস্যা মায়া চাইতেছেন।' সে আমাকে বলল, প্রায় এক মাসেরও বেশি হয় সে দেলগাদিনাকে দেখেনি। তার মনে হয়, মেয়েটি আমার ভাঙচুর মার্কা ব্যবহারের পর যে ভয় পেয়েছিল, সেটা এতটা ভালোভাবে কাটিয়ে উঠেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সে আর আমার প্রসঙ্গে কোনো কথা বলে না বা আমার খোঁজও করে না। নতুন কাজের জায়গায় সে খুব ভালো আছে, বোতাম সেলাইয়ের চেয়ে আরও বেশি আরামের কাজ আর বেতনও ভালো। টগবগ করা আগুনের হলকা আমাকে ভেতরে ভেতরে পোড়াল। 'বেশ্যাবৃত্তি ছাড়াও আর কী কাজ করতে পারে,' আমি বললাম। একটুও চোখের পলক না ফেলে রোসা জবাব দেয়, 'বেকুবের মতো কথা বইলেন না। ওটাই যদি সত্যি হইত, তাহলে তো মাইয়াটা এখানেই কাজ করত। এর চেয়ে ভালো ও আর কোথায় থাকব?' তার যুক্তির তাৎক্ষণিকতায় আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। আমি কীভাবে জানব যে ও ওখানে নেই? যদি সে থাকেই, সে জবাব দিল, 'সেটা আপনার না জানাই ভালো। ঠিক কই নাই?' আবারও তার প্রতি ঘৃণা এল। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে রোসা প্রতিশ্রুতি দিল যে মেয়েটির খোঁজ সে লাগাবে। খুব একটা আশার কিছু নেই, মেয়েটির যে প্রতিবেশীর বাসায় সে ফোন করে মেয়েটিকে খবর দিত, সেই ফোনের লাইনটা অনেক দিন ধরে কাটা এবং মেয়েটি যে কোথায় থাকে সেটার আগা-মাথা সে কিছুই জানে না। কিন্তু তার জন্য মরার কোনো মানে হয় না। সে বলল, 'আমি আপনারে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফোন করুম।'

সেই এক ঘণ্টার নাম করে সে তিন দিন লাগিয়ে দিল, সে মেয়েটির খবর পেয়েছে এবং মেয়েটি ভালো আছে। আমি আবার ফিরলাম, মনের আঘাত নিয়ে এবং ওর প্রতিটি ইঙ্গিতে চুমু খেলাম, অনুশোচনায়, রাতের ১২টা থেকে একেবারে মোরগ ডাকা ভোর পর্যন্ত। আমাকে ক্ষমা কোরো বলতে বলতে শুরু থেকে শেষ হতে না-হতেই আবার একই কথা ধরে শুরু এবং এ যেন শুরু থেকেই পুনরায় শুরু করা। রুমটায় সবকিছু কেমন উদলা-উদলা, আর আমি যা যা রেখেছিলাম সেগুলো অতি ব্যবহারে নষ্ট। রোসা কাবার্কাস রুমটা ওভাবেই ফেলে রেখেছে এবং বলেছে যে যদি কিছু করতে হয় তো আমাকেই করতে হবে, ওর কাছে আমার অবশিষ্ট দেনাপাওনা হিসেবে। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা বলতে গেলে তখন যাচ্ছেতাই। আমার পেনশনের টাকায় আর কুলান দিচ্ছিল না। আমার মায়ের পবিত্র মণি-রত্নগুলো ছাড়া বাড়িতে বিক্রি করার মতো আর যা কিছু ছিল সেগুলো বিক্রি করে কিছু পাওয়া যাবে না, আর জিনিসগুলো এত পুরোনোও নয় যে পুরাকীর্তি বলে চালানো যায়। আমার সুদিনে গভর্নর সাহেব একবার একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে বিভাগীয় পাঠাগারের জন্য আমার সমস্ত গ্রিক, লাতিন ও স্প্যানিশ ধ্রুপদি সাহিত্যের বইগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছিলেন, কিন্তু ওগুলো বিক্রি করার স্পর্ধা আমার ছিল না। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং পৃথিবীর অবক্ষয় ঘটার দরুন সরকার মহলের কেউ আর শিল্প-সাহিত্য নিয়ে ভাবল না। একটা উপযুক্ত সমাধান খোঁজার অভিযোগে দেলগাদিনা যে গয়নাগাটিগুলো আমাকে ফেরত দিয়েছিল, সেগুলো পকেটে ভরলাম এবং বারোয়ারি বাজারের দিকে চলে যাওয়া একটা গোলমেলে বাজে গলিপথে ভাঙাতে নিয়ে গেলাম। ভাঙাচোরা পানশালা, পুরোনো বইয়ের দোকান এবং বন্ধকি দোকানে ঠাসা ওই জাহান্নামি গলি-ঘুপচির এ-মাথা থেকে ও-মাথা উদ্‌ভ্রান্ত পণ্ডিতের মতো আমি হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু আমার মা ফ্লোরিনা দে দিওসের সম্ভ্রম আমায় বাদ সাধল, আমার সাহস হলো না। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, সবচেয়ে পুরোনো এবং নামকরা জুয়েলারি দোকানের কাছে গয়নাগুলো বিক্রি করব একটুও মাথা হেঁট না করে।

দোকানদার তার আতস কাচে পরখ করতে করতে আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে একটা সমীহ জাগানো হাবভাব এবং কেমন একটু ডাক্তারবাবু মার্কা ভাব ছিল। আমি ব্যাখ্যা করলাম যে গয়নাগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে আমার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। সে আমার প্রতিটি ব্যাখ্যা মেনে নিল এবং অবশেষে আতস কাচ সরিয়ে নিল।

'দুঃখিত,' সে বলল, 'ওগুলো তো বোতলের নিচের অংশ।'

আমাকে আশ্চর্য হতে দেখে সে সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করল : সোনা যেমন সোনাই আর প্লাটিনাম প্লাটিনামই, সে রকম। আমি আমার পকেট ধরে দেখলাম, ক্রয়ের রসিদটা সঙ্গে এনেছি কি না এবং নালিশের ভাব ছাড়াই বললাম, 'ঠিক আছে, কিন্তু ওগুলো তো এই অভিজাত দোকান থেকেই একশ বছর আগে কেনা।'

তার মুখের ভাবভঙ্গি একটুও বদলাল না। 'ব্যাপারটা হলো এই যে,' সে বলে, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গয়নাগাটি থেকে সবচেয়ে দামি পাথরগুলো গায়েব হয়ে যেতে থাকে, আর ওগুলোর বদলে পরিবারের বেয়াড়া সদস্যরা বা শয়তান গয়না ব্যবসায়ীরা অন্য কিছু বসিয়ে দেয় এবং ব্যাপারটা কেবল তখনই ধরা পড়ে, যখন কেউ একজন ওগুলো বিক্রি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাকে একটু সময় দেন।' এই বলে সে গয়নাগুলো নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে কোথায় যেন গেল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরল এবং কোনো রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আমাকে বসার জন্য ইশারা করল এবং কাজ করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দোকানটা ঘুরেফিরে দেখলাম। দোকানটায় অনেকবারই মায়ের সঙ্গে এসেছি এবং আমার মনে পড়ল, প্রতিবার মা বলতেন : *তোর বাবাকে বলিস না*। হঠাৎ করেই আমার মাথায় একটা খেয়াল এল, যেটা আমাকে একটু বাড়তি সুবিধা দিল। এমন কি হতে পারে না যে রোসা কাবার্কাস ও দেলগাদিনা দুজন মিলে আসল পাথরগুলো বিক্রি করে দিয়েছে এবং আমাকে নকল পাথর বসানো গয়না ফেরত দিয়েছে?

সন্দেহে আমি যখন পুড়তে লাগলাম, তখন দোকানের এক মেয়ে কর্মচারী এসে আমাকে সেই একই পেছনের দরজা দিয়ে তার পেছন পেছন বড় বড় বইয়ে ঠাসা লম্বা লম্বা অনেক বইয়ের শেলফভরা একটা ছোট অফিসঘরে নিয়ে গেল। অফিসঘরের একেবারে ওই পাশে একটা ডেস্কে বসা এক দশাসই বেদুইন উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে হাত মেলাল। বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর মতো উচ্ছ্বসিত আবেগে আমাকে তুমি সম্বোধন করল। 'মাধ্যমিক স্কুলে আমরা একসঙ্গে ছিলাম,' কুশল বিনিময় করতে করতে সে বলল। ওকে মনে রাখাটা খুব সহজ ছিল, স্কুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিল সে এবং আমাদের মধ্যে বেশ্যালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন ছিল। এরপর কবে থেকে যেন ওর কোনো হদিস আর পাইনি এবং আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে এতটা থুত্থুড়ে মনে হয়েছে তার কাছে যে আমাকে তার বাল্যকালের এক ক্লাসমেটের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছিল।

ডেস্কের কাচ বসানো উপরিভাগে সংরক্ষিত মোটা গাদা একটা খাতা যেটাতে আমার মায়ের অলংকারের নথিপত্রের স্মৃতি। পাকা হিসাব, দিন-তারিখসহ লেখা আছে, কীভাবে আমার মা নিজেই এসে দুই পুরুষের পুরোনো সুন্দর ও দামি কারগামান্তোস পাথরের বদলে অন্যকিছু বসিয়ে নিয়েছিলেন এদের কাছ থেকে এবং এদের কাছেই মূল পাথরগুলো বিক্রি করে দিয়েছিলেন। দোকানের বর্তমান মালিকের বাবা অলংকারের দোকানটার সামনেই বসা ছিলেন এবং আমরা দুজন একই সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এভাবেই আমার মায়ের অলংকারের পাথরগুলোর হদিস মিলল। কিন্তু সে আমাকে ভরসা দিল : এ ধরনের টুকিটাকি চালাকি সেসব দিনে হরহামেশাই হতো বড় বড় পরিবারের দুঃসময়ে, যাতে সম্মান-টম্মান না খুইয়েই জরুরি ভিত্তিতে টাকাটা মেলে। এই রূঢ় বাস্তবতার সামনে পড়ে আমি ওই অলংকারগুলো সেই অন্য এক ফ্লোরিনা দে দিওসের স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়ারই পক্ষপাতী হলাম, যার পরিচয় আমি কোনো দিনই পাইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলাই মাসের শুরুর দিকে মৃত্যু যে খুব একটা দূরে নয় সেটা টের পেলাম। হৃৎকম্পনে ছন্দপতন ঘটল এবং আমার চারপাশে সময় শেষ হয়ে আসার নির্ভুল লক্ষণগুলো দেখতে পড়তে শুরু করলাম। চারুকলার এক কনসার্টে যেটা ঘটল, সেটা তো একেবারে পরিষ্কার। মিলনায়তনের এসি কাজ করছে না, শিল্প-সাহিত্যের সব মহারথী হলরুমের ভিড়ের মধ্যে গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরের মূর্ছনায় এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হলো সেখানটায়। শেষের দিকে ওরা যখন *আল্লেগ্রেত্তো পোকো মোসসো* বাজাচ্ছিল, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ বিভ্রান্তিকর এই চিন্তাটা আমার কাছে ধরা দিল যে আমার মৃত্যুর আগে কপালে বোধ হয় আর কোনো কনসার্ট দেখা হবে না, আর অমনি কাঁপন ধরে গেল। কোনো রকম দুঃখ বা ভয় পেলাম না, কিন্তু কেমন একটা অপ্রতিরোধ্য অনুভব, এত দিন বেঁচে থাকার পরও যা কখনো হয়নি।

শেষ পর্যন্ত যখন ঘামে ভিজতে ভিজতে আলিঙ্গন আর ফটোসেশনের ভিড় ঠেলে আমি বেরিয়ে এলাম, তখন নিজেই অবাক হয়ে গেলাম সামনে শিমেনা ওরতিস্‌কে দেখে—হুইলচেয়ারে শতবর্ষী দেবীর বেশে। প্রাণঘাতী পাপের মতো তাঁকে দেখেই অতীতের সব চাপ এসে ঘিরে ধরল। তাঁর গায়ের ত্বকের মতো মসৃণ আইভরি-রঙা সিল্কের একটা কোট পরনে তাঁর, খাঁটি মুক্তার তিন ফুল বসানো একটা হার, ১৯২০-এর স্টাইলে কাটা মুক্তা-রঙা চুল, গালে শঙ্খচিলের পাখনার ডগা, আর এক জোড়া বড় বড় হলুদ চোখ, যা ঘন করে আঁকা ন্যাচারাল শ্যাডোতে রঞ্জিত। তাঁর বেশভূষা দেখলে মনেই হবে না যে তাঁর স্মৃতির এক অপরিশোধ্য ক্ষয়ে তিনি মন থেকে সব ভুলতে বসেছেন—যদিও জোর গুজব তা-ই। নিথর এবং কোনো রকম সংগতি ছাড়াই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার গালে অনুভব করা আগুনের হলকাটা থেকে কোনোরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে ভারসাই কায়দায় নীরবে নত হয়ে তাঁকে কুর্নিশ করলাম। তিনি রানির মতো হাসলেন এবং আমার হাত আঁকড়ে ধরলেন। তখন আমি বুঝলাম যে এটাও নিয়তিরই খেলা এবং এই সুযোগে একটা কাঁটা খুলে নিলাম, যেটা বহুদিন আমাকে জ্বালিয়েছিল। 'বহু বছর ধরে আমি এই মুহূর্তটার স্বপ্ন দেখে আসছি,' আমি বললাম। তিনি বুঝলেন বলে মনে হলো না। 'কী বলো!' তিনি বললেন। 'আর তুমি কে?' আমার কোনো দিনই জানা হয়নি তিনি কি সত্যি সত্যিই ভুলে গিয়েছিলেন, নাকি এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ প্রতিশোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে আমাকেও যে একদিন মরতে হবে, হঠাৎ করে এটা বুঝেছিলাম আমার পঞ্চাশতম জন্মদিনের কিছুক্ষণ আগে—ঠিক এ রকম একটা ঘটনায় কার্নিভালের যে রাতে আমি আপাচে তাংগো নাচ নেচেছিলাম এক অসামান্য রমণীর সঙ্গে, যার মুখ আমি কোনো দিন দেখিনি, যে আমার চেয়ে ওজনে ৪০ পাউন্ড বেশি এবং প্রায় এক ফুট লম্বা ছিল, কিন্তু তার পরও সে নিজেকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছিল, তাকে ধরে নাচার সময় মনে হয়েছিল যেন বাতাসে ভেসে বেড়ানো কোনো পালক। আমরা এতটা ঘনিষ্ঠভাবে নেচেছিলাম, তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম আমি এবং তার জোরালো শ্বাস-প্রশ্বাসে, তার গায়ের অ্যামোনিয়া মার্কা গন্ধে, তার স্তনের বিশালতায় আমি আনন্দে নেতিয়ে পড়েছিলাম, সেবারই প্রথম মৃত্যুর গর্জনে আমি কেঁপে উঠেছিলাম এবং প্রায় পড়েই গিয়েছিলাম মাটিতে। নিষ্ঠুর দৈববাণীর মতো আমার কানে বিঁধেছিল: 'তুমি যা-ই করো না কেন, সেটা এ বছরই হোক বা পরবর্তী একশ বছরেই হোক, মরণ তোমার হবেই চিরদিনের জন্য।' রমণীটি ভয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল: 'কী হলো?' 'না, কিছু না,' আমি বললাম, হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায়।

'তোমার জন্যই আমার এই কাঁপন।'

তখন থেকেই আমি আমার জীবনটাকে বছর নয়, বরং দশকের নিরিখে পরিমাপ করতে শুরু করলাম। পঞ্চাশের দশকটার কথা আলাদা করে বলা যায়। কারণ, তখনই আমি প্রথম অনুধাবন করলাম যে আশপাশের প্রায় সবাই আমার চেয়ে বয়সে তরুণ। ষাটের দশকটা ছিল সবচেয়ে বেশি আবেগতাড়িত। কেননা, মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধল যে কোনো রকম ভুল করার সময় আমার হাতে আর নেই। সত্তরের দশকটা ছিল ভয়ানক, কারণ এই সম্ভাবনাটা উঁকিঝুঁকি মারছিল, বোধ হয় শেষ দশক পার করছি। এতসবের পরও আমার নব্বইয়ের দশকের প্রথম সকালে দেলগাদিনার সুখী শয্যাপাশ থেকে জেগে উঠে, জীবন্ত এই আমি এই প্রীতিকর ধারণার বশবর্তী হয়ে স্থাণু হয়ে গেলাম যে জীবন হেরাক্লিটাসের সদাপরিবর্তনশীল নদীর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া কোনো কিছু নয়, বরং গ্রিলের ওপর উল্টেপাল্টে এপাশ থেকে ওপাশ করতে করতে আরও নব্বই বছর তপ্ত হওয়া।

আমি এমন একজন হয়ে গেলাম যে অল্পতেই কান্না পায়। স্নিগ্ধতা ও আবেগের কোনো ঘটনা হলেই হলো, অমনি আমার গলা ফুঁপিয়ে কান্না বের হয়ে যাওয়ার জোগাড় এবং দেলগাদিনা যে ঘুমিয়ে থাকে আর আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে বসে আনমনে ওকে দেখি, এই চিন্তা যে আনন্দ এনে দেয়, সেটা বাদ দেওয়ার কথা ভাবলাম, এর পেছনে আমার মৃত্যুর অনিশ্চয়তার চেয়েও ওকে ছাড়া বাকি জীবনটা যে কাটাতে হবে, এটা ভেবেই যে কষ্টটা হয়, সেটাই বেশি কাজ করছিল। অনিশ্চয়তায় ভরা সেই দিনগুলোতে একদিন কেমন করে জানি আমি বিখ্যাত লোস নোতারিওস সড়কে গিয়ে হাজির, এবং আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সেই সস্তা পুরোনো হোটেলটা আজ একটা ধ্বংসস্তূপ কেবল, আমার ১২ নম্বর জন্মদিন পূর্ণ হওয়ার খানিকক্ষণ আগে এই হোটেলেই আমাকে জোর করে ভালোবাসার রঙ্গলীলা শেখানো হয়েছিল। বিশাল ভবনটা ছিল জাহাজ মেরামতকারীদের শহরের আরও কয়েকটা জাঁকালো ভবনের মতো, শ্বেত স্ফটিকের আস্তরণ দেওয়া কলাম আর সঙ্গে অন্দরমহলের উঠানে চারপাশে সোনালি কারুকাজ এবং কনজারভেটরির পেলবতা মাখানো আলোকোজ্জ্বল সাত রঙের ছোট গোলাকার সুদৃশ্য গম্বুজ। একশ বছরেরও বেশি কাল ধরে, রাস্তা থেকে গথিক দরজা দিয়ে ঢুকে নিচের তলায়, ছিল ঔপনিবেশিক নোটারির অফিস, যেখানে আমার বাবা কাজ করেছেন, উন্নতি করেছেন এবং আজগুবি সব স্বপ্ন দেখতে দেখতে জীবনভর ভুগেছেন। আস্তে আস্তে ঐতিহাসিক পরিবারগুলো ওপরের তলাগুলো ছেড়ে দিল, যেগুলোতে এসে উঠল, নিতান্ত অসচ্ছল কতিপয় রাতের রমণী, যারা সারা রাত ধরে ভোর পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে কেবল ওঠা-নামা করে অদূরের নদীবন্দরের পানশালাগুলো থেকে দেড় পেসোতে ধরে আনা খদ্দেরসহ।

আমার বয়স তখন প্রায় ১২, তখনো হাফপ্যান্ট পরি আর পায়ে থাকত প্রাথমিক স্কুলের বুট, এবং ওই ওপরের তলায় তাকানোর লোভ সামলাতে পারিনি, যখন অন্যদিকে আমার বাবা তাঁর ক্লান্তিকর দীর্ঘ মিটিংয়ের একটিতে তর্কাতর্কি করছিলেন, আর এদিকে আমি দেখলাম স্বর্গীয় এক দৃশ্য। ভোরবেলা পর্যন্ত সস্তা দামে নিজেদের দেহ বিক্রি করছিল যেসব রমণী, তারা দিনের ১১টার পর থেকে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়, রঙিন কাচের উত্তাপে যখন সবকিছু অসহ্য লাগে, এবং তখন তাদের গার্হস্থ্য কাজের জন্য বাড়ির এমাথা-ওমাথা ল্যাংটা হয়ে পায়চারি করা ছাড়া আর উপায় থাকে না আগের রাতের অ্যাডভেঞ্চারগুলো নিয়ে নানা কথার চিৎকার জুড়তে জুড়তে। আমার ভয় ধরে গেল। যেভাবে ঢুকেছি সেভাবে আবার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলাম না। ঠিক তখন ওই নগ্ন রমণীদের একজন, যার তরতাজা গা থেকে গেঁয়ো সাবানের সুগন্ধি বের হচ্ছিল, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমাকে তার পিচবোর্ডের ছোট কক্ষে নিয়ে গেল, কিন্তু আমি তাকে দেখলাম না বাড়ির অন্যান্য বিবস্ত্র অধিবাসিনীর চিৎকার-চেঁচামেচি আর করতালির মধ্য দিয়ে। আমাকে চার-চারটি ঘণ্টা মুখ উপুড় করে শুইয়ে রাখল, ওস্তাদের মতো পাকা হাতে আমার প্যান্ট টেনে খুলে ফেলল এবং আমার দুই পা ফাঁক করল, কিন্তু আমার শরীরজুড়ে যে ভয়ের কাঁপন ধরল, তাতে পুরুষালি ভঙ্গিতে তাকে আমার শরীরে মেশাতে পারলাম না। সে রাতে, এই আক্রমণাত্মক ঘটনার লজ্জায় নিজের বাড়ির বিছানায় নির্ঘুম অবস্থায় ও রমণীকে আবার দেখার ছটফটানিতে এক ঘণ্টার বেশি ঘুম হয় না আমার। কিন্তু পরের দিন সকালে, রাতের প্যাঁচারা ঘুমিয়ে গেলে পর আমি কাঁপতে কাঁপতে তার কক্ষে গিয়ে হাজির হলাম এবং তাকে জাগিয়ে তুললাম, পাগলের মতো ভালোবাসতে বাসতে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম এবং ব্যাপারটা চলল বাস্তব জীবনের চড়া বাতাস এসে নিষ্ঠুরের মতো বয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। মহিলার নাম ছিল কাস্তোরিনা এবং সে ছিল ওই বাড়ির রানি।

ওই হোটেলের ছোট ছোট কক্ষে ছোটখাটো ভালোবাসার রঙ্গলীলার রেট ছিল এক পেসো, কিন্তু আমাদের মধ্যে অল্প কজনই জানত যে ২৪ ঘণ্টার জন্যও রেটটা একই। কাস্তোরিনা তার ভাঙাচোরা জগতের সঙ্গেও আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, যেখানে রমণীরা তাদের দরিদ্র খদ্দেরদের নিমন্ত্রণ জানাত বড়সড় সকালের নাশতার পর্বে, তাদের সাবান ধার দিত, দাঁতের ব্যথা হলে দেখভাল করত এবং গুরুতর অবস্থার সময় তাদের দাতব্য ভালোবাসাও দিত।

কিন্তু আমার বার্ধক্যের পড়ন্ত বেলায় কেউ অবিস্মরণীয় কাস্তোরিনাকে মনে রাখেনি, কোন কালে মরে গেছে কে জানে, নদীর ঘাটের দুর্দশাগ্রস্ত এলাকা থেকে যে একদিন সর্দারনির পবিত্র সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছেছিল জলদস্যুর পট্টি পরে এক চোখে, যে চোখ সে এক পানশালার মারামারির সময় খুইয়েছিল। তার শেষ জমানার একমাত্র মদ্দা পুরুষ, কামাগুয়েই অঞ্চলের কৃষ্ণ হোনাস এল গালেয়োতে নামের সেই দাস ছিল হাবানার সেরা ট্রাম্পেট বাদকদের একজন, যত দিন না এক সর্বনাশা ট্রেন দুর্ঘটনায় তার মুখভর্তি হাসিটা দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেল।

সেই দুঃখজনক দর্শনের অভিজ্ঞতার পর আমি আমার বুকে একটা ঢিপঢিপ ব্যথা অনুভব করলাম, যা অনেক রকমের ঘরোয়া দাওয়াই-পথ্য নেওয়ার পর তিন দিনেও গেল না। জরুরি রোগী হিসেবে যে ডাক্তারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাতে গেলাম, তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য, সেই দাদার নাতি, যিনি আমাকে দেখেছিলেন আমার বয়স যখন বেয়াল্লিশ এবং এই ব্যাপারটায় আমি ভয় পেলাম যে তারা দেখতে অবিকল এক, বিশেষ করে অল্প বয়সেই তার টাক পড়ে যাওয়ায় আরোগ্যের সম্ভাবনাহীন ক্ষীণদৃষ্টির চশমা, আর তার সান্ত্বনাতীত মনমরা ভাবের কারণে তাকে এতটা বুড়ো লাগে যেরকমটা তার দাদাকে লেগেছিল সত্তর বছর বয়সে। স্বর্ণকারের মনোযোগ নিয়ে সে আমার গোটা শরীরের সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল। আমার বুক পরীক্ষা করল ও পেছনটা দেখল এবং মেপে দেখল আমার রক্তচাপ, আমার হাঁটুর রিফ্লেক্স, চোখের তল, চোখের নিচের পাতার রং। পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে, যে টেবিলে শুয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, সেটার ওপর এপাশ থেকে ওপাশ হওয়ার সময় সে আমাকে এত অস্পষ্ট এবং দ্রুত কিছু প্রশ্ন করল যে আমি জবাব দেওয়ার কোনো সময় খুঁজে পেলাম না। এক ঘণ্টা পর সে আমার দিকে একটা খুশির হাসি দিয়ে তাকাল। 'হুঁ,' সে বলল, 'আমার মনে হয় না আপনার জন্য আমার কিছু করার আছে।' 'কী বলতে চাইছেন আপনি?' 'আপনার বয়সে এর চেয়ে ভালো আর কী থাকবেন।' 'কী অদ্ভুত ব্যাপার,' আমি বললাম, আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলেছিলেন আমার বয়স যখন ছিল বেয়াল্লিশ এবং তাহলে তো মনে হয় সময় পারই হয়নি।' 'আপনাকে সব সময়ই এ রকম কথা কেউ না কেউ বলবে,' সে বলল, 'কারণ আপনি সব সময়ই কোনো না কোনো বয়সের তো হবেনই।' সে যাতে ভয়ংকর কিছু একটা বলে, সেই উসকানিমূলক চেষ্টায় আমি বললাম, 'একমাত্র মৃত্যুই ধ্রুব।' 'জি,' সে বলল, 'কিন্তু আপনার মতো এত ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে ওই জায়গায় পৌঁছানো তো এত সহজ নয়। আমি খুবই দুঃখিত যে আমি আপনার কথামতো কিছু করতে পারছি না।'

এসবই ছিল সুখকর স্মৃতি, কিন্তু ২৯ আগস্টের আগে বিস্তর চাপ অনুভব করলাম আমার সামনের অনাগত শতাব্দীর, ভাবলেশহীন, ভারী পা টেনে টেনে আমার বাড়ির সিঁড়ি বাইতে বাইতে। তার পরই দেখলাম মাকে, ফ্লোরিনা দে দিওস, আমার খাটে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেটা তাঁরই বিছানা ছিল, এবং মা আমাকে সেই একই কথা বলে আশীর্বাদ করলেন, যেটা তিনি আমাকে বলেছিলেন শেষবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, তাঁর মৃত্যুর দুই ঘণ্টা আগে। আবেগের উথাল-পাথাল অবস্থার মধ্যে আমি এটাকে শেষবারের হুঁশিয়ারি হিসেবে ধরে নিলাম এবং আমি রোসা কাবার্কাসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন করে বললাম আমার বালিকাটিকে সে রাতেই আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য, পাছে না আবার আমার নব্বইতম বছরের শেষক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশাটা অপূর্ণই থেকে যায়। আটটার সময় আবার তাকে ফোন করলাম এবং আবারও সে জানাল যে সম্ভব নয়। করতেই হবে যে করেই হোক, আমি আতঙ্কে চিৎকার দিলাম। সে বিদায় না জানিয়েই ফোনটা রেখে দিল, কিন্তু ১৫ মিনিট পর আবার ফোন করল :

'ঠিক আছে, মাইয়াটা আসছে।'

আমি রাত ১০টা বেজে ২০ মিনিটে পৌঁছালাম এবং আমার জীবনের শেষ চিঠিগুলো রোসা কাবার্কাসের হাতে দিলাম, মেয়েটির জন্য কিছু জিনিসপত্রের ব্যবস্থাসহ, যাতে সে ওগুলো পায় আমার ভয়াবহ পরিণতির পর। সে ভাবল, ওই ছুরির আঘাতে খুনের ঘটনাটা আমাকে শঙ্কিত করে তুলেছে এবং ঠাট্টার সুরে বলল, 'যদি আপনি মারাও যান, দয়া কইর‍্যা এখানটায় মইরেন না; ভাইবা দেখেন তো অবস্থাটা কী হইব।' কিন্তু আমি তাকে বললাম, 'ধরো, আমি যদি পুয়ের্তো কলম্বিয়ায় ট্রেনের নিচে চাপা পড়ি, ওই বাজে, ফালতু, লক্কড়ঝক্কড় জিনিসটা তো মানুষও মারতে পারবে না।'

সে রাতে, সবকিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তো নব্বই পেরিয়ে একানব্বই-এ গিয়ে পড়ব আমি সে ক্ষণটায় জীবনে শেষবারের মতো ব্যথা-বেদনা অনুভব করব, এই আশায় বিছানায় শুতে গেলাম। দূরের ঘণ্টাধ্বনি কানে এল, পাশে ঘুমিয়ে থাকা দেলগাদিনার বুকের খুশবু নাকে এল, দিগন্তে একটা চিৎকার শুনলাম, হয়তো এই রুমে একশ বছর আগে মারা যাওয়া কারও বিলাপ। আমার শেষ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটুকু নিয়ে রুমের বাতি নিভালাম, আমার আঙুল দিয়ে ওর আঙুল পেঁচিয়ে ধরলাম, যাতে ওকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারি এবং আমার শেষ ১২টা কান্নার ফোঁটাসহ ঘড়ির রাত ১২টার ঢং ঢং ১২টা ধ্বনি শুনলাম আর সময় বাড়তে বাড়তে একসময় মোরগ ডাকতে শুরু করল, তার পরই বিজয়ের ঘণ্টা, উৎসবের আতশবাজি এই খুশিতে যে জীবনের নব্বইটা বছর পার করে দিলাম ভালোয় ভালোয়।

আমার প্রথম কথাগুলো ছিল রোসা কাবার্কাসের জন্য : তোমার এই বাড়িটা কিনতে চাই আমি, সবকিছু, দোকানটা এবং ফলবাগানসহ সব। সে বলল, 'চলেন, আমরা পুরোনো দিনের মানুষের মতো একটা বন্দোবস্ত করি, নোটারির সামনে সই কইর‍্যা : আমগো মধ্যে যে বাঁইচা থাকব, সে যে মইর‍্যা যাইব তার সব জিনিস রাইখ্যা দিব না। কারণ আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার সব জিনিস পাবে মেয়েটি। কথা তো একই দাঁড়াইল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোসা কাবার্কাস বলল, 'আমি মাইয়াটার দেখভাল করুম এবং তারপর ওরে সব দিয়া দিমু, আপনার যা কিছু এবং আমার যা যা আছে; আমার তো এই জগতে আর কেউ নাই। এর মধ্যে আপনার রুমটা আবার ঠিকঠাক করাইয়া দিমু এবং পানির কলটল, এয়ারকন্ডিশন সব লাগাইয়া দিমু, এবং লগে আপনার বই ও গানের জিনিসপত্র তো থাকবই।'

'তোমার কি মনে হয় মেয়েটি এতে রাজি হবে?'

'হায় রে আমার পণ্ডিত, বুড়া হন ঠিক আছে, কিন্তু গর্দভের মতো কথা বলেন কেন'—বলে রোসা কাবার্কাস, হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। 'ওই বেচারি তো আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাইতাছে।'

আমি বেরিয়ে রাস্তায় গেলাম, আনন্দোজ্জ্বল এবং প্রথমবারের মতো আমার প্রথম শতাব্দীর দূরবর্তী দিগন্তে নিজেকে চিনতে পারলাম। আমার বাড়িটা, নিরিবিলি এবং সোয়া ছয়টায় ঠিকঠাক অবস্থায় এক আনন্দময় ভোরের রঙের খেলায় মেতে উঠতে শুরু করেছে। দামিয়ানা গলা ছেড়ে গান করছিল রান্নাঘরে এবং পুনরুজ্জীবিত বিড়ালটি আমার পায়ের কাছে তার লেজটা নাড়ছিল এবং আমার সঙ্গে আমার লেখার টেবিল পর্যন্ত হেঁটে গেল। আমি গুছিয়ে রাখছিলাম মনমরা হয়ে পড়ে থাকা আমার কাগজপত্র, দোয়াত, হাঁসের পালক, পার্কের বাদামগাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য যখন ঢুকে পড়ছিল এবং চিঠিপত্রে বোঝাই নৌকাটি, খরার কারণে এক সপ্তাহ বিলম্বে আসা, হাঁকডাক ছাড়ল নদীবন্দরের সংকীর্ণ নালিপথে ঢোকার সময়। সবশেষে এই হলো সত্যিকারের জীবন, হৃদয় আজ কানায় কানায় পূর্ণ আর আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসের নিদারুণ যন্ত্রণায় আমার শততম জন্মদিনের পর যেকোনো দিন ভালোবাসার সুখ নিয়ে মরে যাওয়ার দণ্ডে দণ্ডিত।

মে ২০০৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনপঞ্জি

১৯২৭ : ৬ মার্চ কলম্বিয়ার মাগদালেনা বিভাগের আরাকাতাকা গ্রামে টেলিগ্রাফ অপারেটর ও ওষুধসামগ্রী বিক্রেতা গাব্রিয়েল এলিহিও গার্সিয়া এবং তাঁর স্ত্রী লুইসা সান্তিয়াগা ইগুয়ারানের প্রথম সন্তান গাব্রিয়েল হোসে গার্সিয়া মার্কেসের জন্ম।

১৯৩০ : বাবা-মাকে ছেড়ে মাতামহীদের সঙ্গে বড় হওয়া শিশু গার্সিয়া মার্কেস ২৭ জুলাই প্রথমবারের মতো ভালো করে দেখলেন ও চিনলেন নিজের মাকে।

১৯৩৬ : নয় বছর বয়সে *সহস্র ও এক আরব্য রজনী* পড়া শুরু।

১৯৩৭ : মার্চ মাসে ৭৩ বছর বয়সে মাতামহ কর্নেল নিকোলাস রিকার্দো মার্কেস মেহিয়ার মৃত্যু।

১৯৪০ : কবিতা লেখার শুরু এবং স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রকাশ।

১৯৪৩ : প্রথমবারের মতো রাজধানী বোগোতা সফর এবং সরকারি বৃত্তি নিয়ে বোগোতার কাছাকাছি সিপাকিরায় মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা শুরু।

হাবিয়ের গার্সেস ছদ্মনামে বোগোতার *এল তিয়েম্পো* পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে লেখা প্রকাশ। সুক্রে সফরকালে আর এক ওষুধসামগ্রী বিক্রেতার কন্যা মের্সেদেস বার্চাকে প্রথমবারের মতো দর্শন; যিনি ভবিষ্যতে হবেন তাঁর স্ত্রী।

১৯৪৭ : অন্ধ ও মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় মাতামহীর মৃত্যু।

এল এস্পেক্তাদোর দৈনিকে প্রথম গল্প *লা তেরসেরা রেসিগনাসিওন*-এর প্রকাশ। একই দৈনিকে পরের মাসে আরেকটি গল্প *এবা এস্তা দেত্রো দে সু গাতো*-র প্রকাশ। এ গল্পগুলো পরবর্তী সময়ে স্থান পায় *ওহোস দে পেররো আসুল* (নীল কুকুরের চোখ) গল্পগ্রন্থে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৮ : গার্সিয়া মার্কেসের বোগোতার আবাসিক হলের কাছেই বসবাস করা কলম্বিয়ার উদারপন্থী নেতা হোর্হে এলিয়েসের গাইতানের খুনকে ঘিরে গড়ে ওঠা *বোগোতাসো* নামের আন্দোলনের সময়ে কিউবার তরুণ ছাত্র ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে পরিচয়।

১৯৫০ : বার্‌রানকিয়ায় গমন এবং *এল এরালদো* পত্রিকায় লা হিরাফা (জিরাফ) শিরোনামে ভার্জিনিয়া উলফের মিসেস ডলোওয়ের চরিত্র অবলম্বনে সেপ্তিমুস ছদ্মনামে দৈনিক কলাম লেখা শুরু।

১৯৫২ : মার সঙ্গে শৈশবের আরাকাতাকায় যাওয়া, মাতামহের বাড়ি বিক্রির উদ্দেশ্যে, যে বাড়িতে তাঁর জন্ম। *এল এরালদো* পত্রিকায় এল ইনবিয়েরনো (শীতকাল) শিরোনামে প্রথম উপন্যাস *লা ওহারাস্কা*-এর (পাতার ঝড়) একটি অধ্যায় প্রকাশ। পয়সার অভাবে বন্ধু আলবারো সেপেদোসহ গুয়াহিরার রাস্তায় বিশ্বকোষ বিক্রি।

১৯৫৪ : বোগোতায় ফিরে এসে বন্ধু আলবারো মুতিসের সহায়তায় *এল এস্পেক্তাদোর* পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে যোগদান। কলম্বিয়ার কোনো পত্রিকায় প্রথমবারের মতো সিনেমাবিষয়ক সাপ্তাহিক কলাম লেখার শুরু তাঁর হাতে।

এল এস্পেক্তাদোর পত্রিকায় ১৪ কিস্তিতে লেখা অনুসন্ধানী 'রেলাতো দে উন নাউফ্রাগো' (এক জাহাজ ডোবা নাবিকের কাহিনি) নামক রিপোর্টটির ধারাবাহিক সাফল্যে পত্রিকাটির বিক্রি দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া। ছোটগল্প 'উন দিয়া দেসপুয়েস দেল সাবাদো'-এর (শনিবারের পরের দিন) জন্য লেখক-শিল্পী সংঘের পুরস্কার লাভ।

১৯৫৫ : স্বৈরশাসক গুস্তাবো রোহাস পিনিইয়া কর্তৃক বন্ধ-ঘোষিত *এল এস্পেক্তাদোর* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে ইউরোপ সফর।

মিতো (মিথ) ম্যাগাজিনে 'ইসাবেল বিয়েন্দো য়োবের সোব্রে মাকোন্দো' (ইসাবেলের স্বগতোক্তি : মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখা) ছোটগল্পের প্রকাশ।

বোগোতায় প্রথম উপন্যাস *লা ওহারাস্কা* (পাতার ঝড়) প্রকাশ।

১৯৫৬ : প্যারিসে বসে *এল কোলোনেল নো তিয়েনে কিয়েন লে এস্ক্রিবা* (কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না) উপন্যাসের খসড়া তৈরি।

১৯৫৭ : ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ভ্রমণ।

১৯৫৮ : মার্চ মাসে বাররানকিয়ায় মোর্সেদেস বার্চাকে বিবাহ। *এল কোলোনেল নো তিয়েনে কিয়েন লে এস্ক্রিবা* (কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না) প্রকাশ।

১৯৫৯ : কিউবা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর পর ফিদেল কাস্ত্রোর আমন্ত্রণে হাভানা গমন এবং কিউবা ও ফিদেলের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের সূচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোগোতায় ফিরে এসে কিউবা বিপ্লব-উৎসজাত *প্রেনসা লাতিনা*-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু।

১৯৬২ : *লোস ফুনেরালেস দে লা মামা গ্রান্দে* (বড় মায়ের অন্ত্যেষ্টি) নামক গল্পগ্রন্থের প্রকাশ মেহিকোতে।

১৯৬৩ : মেহিকান লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেসসহ এক ডজন চিত্রনাট্যের কাজ সম্পাদনা।

এককভাবে জীবনের প্রথম চিত্রনাট্য *এল গাইয়ো দে ওরো* (সোনার মুরগি) রচনা হুয়ান রুলফোর একটি গল্প অবলম্বনে।

১৯৬৫ : মেহিকোন লেখক হুয়ান রুলফোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং *এন এস্তে পুয়েবলো নো হাই লাদ্রোনেস* (এই গ্রামে কোনো চোর নেই) গল্প অবলম্বনে নির্মিত সিনেমায় লুইস বুনুয়েল এবং হুয়ান রুলফোসহ অভিনয়।

১৯৬৭ : জুন মাসে বুয়েনোস আইরেস থেকে এদিতোরিয়াল সুদামেরিকানা প্রকাশ করে *সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ* (নিঃসঙ্গতার এক শ বছর)

জুলাই মাসে বেনেসুয়েলার রাজধানী কারাকাসে দ্বাদশ আন্তর্জাতিক লাতিন আমেরিকান সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান এবং পেরুর ঔপন্যাসিক মারিও বার্গাস য়োসার হাতে রোমুলো গাইয়েগোস সাহিত্য পুরস্কারের সম্মাননা তুলে দেওয়া।

অক্টোবরে সপরিবারে বসবাসের জন্য বার্সেলোনা গমন।

১৯৬৯ : বার্সেলোনার বাররিও সাররিয়ার কাপোনাতা সড়কের এক বাড়িতে বসবাস, কাছেই থাকত মারিও বার্গাস য়োসা।

১৯৭৫ : বার্সেলোনা ছেড়ে মোহিকো সিটি চলে আসা। একই সঙ্গে বার্সেলোনা, বোগোতা ও বুয়েনোস আইরেস থেকে উপন্যাস *এল ওতোনিও দেল পাত্রিয়ার্কা* (কুলপতির শরৎ) প্রকাশ।

১৯৭৬ : *ক্রোনিকাস ই রেপোর্তাহেস* (কালপঞ্জি ও খবর) শিরোনামে বোগোতা থেকে সংবাদবিষয়ক লেখালেখির প্রথম বইটি প্রকাশ।

ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে গার্সিয়া মার্কেস ও বার্গাস য়োসার মধ্যে বন্ধুত্বের অবসান।

১৯৮১ : রাজনৈতিক কারণে বোগোতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে মেহিকো সিটিতে বসবাসের শুরু।

বোগোতা, বার্সেলোনা, বুয়েনোস আইরেস ও মেহিকো থেকে *ক্রোনিকা দে উনা মুয়ের্তে আনুনসিয়াদা* (একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি) উপন্যাস প্রকাশ।

চার খণ্ডের *ওব্রা পেরিওদিস্তিকা* (সংবাদপত্রের যাবতীয় লেখা) প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮২ : অক্টোবরে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মেহিকোর নির্বাসন থেকে দেশে ফেরার উদাত্ত আহ্বান।

বিদেশিদের জন্য মেহিকান সরকারের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা *আগিলা আসতেকা* খেতাবে ভূষিত।

বন্ধু প্লিনিও আপুলেইয়ো মেনদোসার সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারভিত্তিক বই *এল ওলোর দে লা গুয়াইয়াবা* (পেয়ারার ঘ্রাণ) প্রকাশ।

১৯৮৫ : ফুন্দাসিওন দেল নুয়েবো সিনে লাতিনো আমেরিকানোর (নব লাতিন আমেরিকান সিনেমা ফাউন্ডেশন) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

বিশদভাবে স্বীয় বাবা-মায়ের কাহিনি অবলম্বনে লেখা উপন্যাস *এল আমোর এন লোস তিয়েম্পোস দেল কোলেরা* (কলেরা মৌসুমে প্রেম) প্রকাশ বছরের শেষে।

১৯৮৬ : চিলির চলচ্চিত্র পরিচালক মিগেল লিত্তিন নির্মিত একনায়কশাসিত চিলের মধ্যকার অন্যায়-অত্যাচারবিষয়ক টিভি সিরিজ অবলম্বনে লেখা *লা আবেনতুরা দে মিগেল লিত্তিন : ক্লানদেস্তিনো এন চিলে* (চিলিতে চোরাগোপ্তা মিগেল লিত্তিনের অভিযান) প্রকাশ।

১৯৮৭ : রাশিয়া সফর ও মিখাইল গরভাচভের সাক্ষাৎকার নেওয়া।

১৯৮৮ : আর্হেন্তিনায় গার্সিয়া মার্কেস-এর প্রথম ও একমাত্র নাটক *দিয়াত্রিবা দে আমোর কোন্ত্রা উন ওমব্রে সেন্তাদো* মঞ্চস্থ।

১৯৮৯ : *এল হেনেরাল এন সু লাবেরিন্তো* (গোলকধাঁধায় সেনাধিনায়ক) উপন্যাসের প্রকাশ।

১৯৯০ : জাপান সফর ও চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

চিলেতে সামরিক জান্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কবি পাবলো নেরুদার পুরোনো বাসভবনের হস্তান্তর পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হন। কলম্বিয়ার জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান।

১৯৯১ : আত্মস্মৃতি লেখা শুরু। স্বদেশ কলম্বিয়ায় ফিরে আসার পরিকল্পনা।

১৯৯২ : মে মাসে ফুসফুসে টিউমার ধরা পড়ে। *দোসে কুয়েন্তোস পেরেগ্রিনোস* (বারো অভিযাত্রীর গল্প) গল্পগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৯৪ : জুলাই মাসে কলম্বিয়ার উপকূলীয় কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াস-এ গার্সিয়া মার্কেস কর্তৃক ফুন্দাসিওন পারা উন নুয়োবো পেরিওদিসমো লাতিনো আমেরিকানো (নব লাতিন আমেরিকান সাংবাদিকতা ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠা এবং সাংবাদিকতার ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষণ দান।

দেল আমোর ই ওত্রোস দেমোনিয়োস (প্রেম আর দানো-বিষয়ক) উপন্যাসের প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৫ : অপহরণের সত্য ঘটনা অবলম্বনে সংবাদভিত্তিক বই *নোতিসিয়া দে উন সেকুয়েস্ত্রোর* (এক অপহরণের খবর) প্রকাশ বোগোতার বইমেলায়।

১৯৯৮ : মেহিকো সিটিতে আত্মস্মৃতির প্রথম অধ্যায় জনসমক্ষে পাঠ।
আরও কয়েকজন কলম্বিয়ান সাংবাদিকসহ *কাম্বিও* ম্যাগাজিনের মালিকানা কেনা।

১৯৯৯ : অসুস্থতা দেখা দিলে জুন মাসে বোগোতার একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হন। বার্সোলোনা থেকে বেরোয় সংবাদপত্রের লেখালেখিভিত্তিক বই *পোর লা লিব্রে* (১৯৭৪-১৯৯৫) : ওব্রা পেরিওদিস্তিকা।

২০০০ : গার্সিয়া মার্কেস ক্যানসার থেকে সেরে উঠছেন বলে কলম্বিয়ায় খবর বেরোনোর এক মাস পর মেহিকোর গুয়াদালাহারায় আন্তর্জাতিক বইমেলা উদ্বোধন করেন।

২০০২ : অক্টোবরে *বিবির পারা কোনতারলা* (জীবনের গল্প বলার জন্যই বেঁচে থাকা) শীর্ষক আত্মস্মৃতির তিন খণ্ডের প্রথমটির প্রকাশ।

২০০৪ : অক্টোবরে *মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তেস* (আমার দুঃখভারাক্রান্ত বেশ্যাদের স্মৃতিকথা) উপন্যাসের প্রকাশ।

২০০৬ : পত্রিকায় চিঠি দিয়ে লেখালেখি ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত।

২০০৭ : আশিতম জন্মবার্ষিকী, *সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ* (নিঃসঙ্গতার এক শ বছর) উপন্যাসটি প্রকাশনার চল্লিশ বছর এবং প্রথম প্রকাশিত গল্প *লা তেরেসেরা রেসিগনাসিওন* (তৃতীয় মৃত্যু)-এর ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে হিস্পানি বিশ্বে বছরজুড়ে উৎসব-আয়োজন— সেমিনার। কলম্বিয়া-ও উপকূলীয় ঔপনিবেশিক শহর কার্তাহেনা দে ইন্দিয়াস-এ স্প্যানিশভাষী একুশটি দেশের একাডেমির আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে *সিয়েন আনিওস দে সোলেদাদ*-এর বিশেষ সংস্করণের প্রকাশনা।

২০০৯ : ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও লেখক জেরাল্ড মার্টিন-এর লেখা গার্সিয়া মার্কেসের জীবনীগ্রন্থ *গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস : এ লাইফ*-এর প্রকাশ।

২০১০ : নভেম্বরে *ইয়ো নো বেঙ্গো আ দেসির উন দিস্কুর্সো* (আমি কোনো বক্তৃতা দিতে আসিনি) বক্তৃতামালা গ্রন্থের প্রকাশনা।

২০১২ : এযাবৎ প্রকাশিত সব গল্প এক মলাটে *তোদোস লোস কুয়েন্তোস* নামে মোন্দাদোরি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত।

২০১৪ : ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় মেহিকো সিটির নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~